মধ্যে গতির তারতম্য দেখা যায়। সাধারণত খরগোশ মাত্রই তীব্র গতিসম্পন্ন। দেহের ওজন যখন ৫ পাউন্ড, গতিবেগ তখন ৪৫ মাইল ঘণ্টায়, মোটরের দৌড়ের কাছাকাছি। রেস হর্সের দেহের ওজন ১০০০ পাউণ্ড, প্রতি ঘণ্টায় তার ছুট ৪০/৪২ মাইল। অনেক বুনো গাধার দৌড়ের বহর ঘোড়ার সমান কিন্তু তাদের দেহের ওজন ঘোড়ার চেয়ে কম— মাত্র ৩০০ পাউন্ডের মতো। গ্রে হাউণ্ডের দেহের ওজন মাত্র ২২ পাউন্ড, সেই অনুপাতে তার চলৎশক্তির বেগ ঘণ্টায় ৩৬ মাইল।

পাখিরা বহুদূরত্ব পার হতে পারে। মেরুপ্রদেশের টারনস প্রতি বছর এগারো হাজার মাইল একবার উড়ে আসে আবার পরে ফিরে যায়। কোনো কোনো হক্‌জাতীয় পাখি ঘণ্টায় একশো পঞ্চাশ মাইল বেগে উড়তে পারে। এমন পাখি আছে যার গতিবেগ আরও বেশি— ঘণ্টায় দুশো মাইল। আফ্রিকার ইন্ জাতীয় পাখি ওড়া ছেড়ে হাঁটায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে। দেহের ওজন ১১০ পাউন্ড হলে কী হয়, তারা ঘণ্টায় ৩১ মাইল বেগে চলতে পারে। কাঙারুর চলন প্রায় ইমুর চলনের কাছাকাছি—ঘণ্টায় ৩০ মাইল আর দেহের ওজন ১৩০ পাউন্ড। মোষের দেহের বহর যত, তাতে ওজন দাঁড়ায় ১৮০০ পাউন্ড, সেই তুলনায় গতিবেগ নেহাৎ কম নয়-ঘণ্টায় ৩০ মাইল। হাতির বপু বিরাট, ওজন ৭০০০ পাউন্ড। সেই নিয়ে গদাই লস্কর চালে সে ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে ছোটে। শেয়াল তার ১২ পাউন্ড ওজন নিয়ে ২০ মাইল বেগে মাত্র যেতে পারে। বরাহের দেহের ওজন অনেক বেশি, ৯০ পাউন্ড। চলৎশক্তি দেখা গেছে ঘণ্টায় ১১ মাইল মাত্র। সজারুর দেহের ওজন যেমন মাত্র ৩ পাউন্ড, তার চলার শক্তিও সীমিত— ঘণ্টায় মাত্র ২ মাইল। উচ্চতর জীবরা পেশির সঞ্চালনের সাহায্যে পা নাড়াতে পারে। যখন কোনো পেশি কাজ করে তখন এডিনোসসিন ট্রাইফসফেট (ইংরাজিতে ATP বলা হয়) নামক রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়ার ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়।

বাইরের চলাটা আসল নয়। এ পৃথিবীতে সব চলার মাঝে যা সত্যকারের চলা তা হল মানুষের নিজের চলা তার মন-ভূমির মধ্যে। মানুষের মনের গতিবেগ আলোর গতিসম্পন্ন—ঘণ্টায় ১৮৬০০০ মাইল। তার কোথাও যেতে নেই মানা। ক্রমবিকাশের দুস্তর পথ পেরিয়ে মানুষ এমন মন পেয়েছে। মনকে চালাবার ক্ষমতাও। মন তার রথ। মন রথ অবাধ। ক্রমবিকাশের ইতিহাসে জানা যায় ঘোড়ার পূর্ব পুরুষদের এখনকার ঘোড়ার মতো খুর ছিল না। হাতে-পায়ে পাঁচ আঙুল বিশিষ্ট জীব ছিল তারা। কিন্তু ক্রমবিকাশের পথ পরিক্রমায় আস্তে আস্তে অন্য আঙুলগুলি অদৃশ্য হলে রইল শুধু মাঝের আঙুলটি, যাকে আমরা খুর বলে জানি। ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঘোড়া ধুলো উড়িয়ে চমক লাগিয়ে ছুটে চলে যায়। কিন্তু মনের দৌড়ে ঘোড়া ততকিছু নয়। মনের দৌড়ে মানুষ চ্যাম্পিয়ন। এই মনকে সঙ্গে নিয়ে মানুষ যুগে যুগে কালে কালে পদচালনা করেছে দিকে দিকে। হুয়েনসাঙ এসেছেন সুদূর চিন থেকে তাঁর মনকে সঙ্গে নিয়ে। ভারতের শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর গেছেন তিব্বতে, ভাসকো-ডা-গামা এসেছেন তুমুল সমুদ্র পেরিয়ে ভারতবর্ষে। আর কলম্বাস তাঁর দুর্জয় মনকে সঙ্গে নিয়ে নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করেছেন। শঙ্করাচার্য পদব্রজে সারা ভারতবর্ষের দিকে দিকে গেছেন ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করবেন বলে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে মানুষ এখন শুধু নিজে চলেই ক্ষান্ত নয়। সে অন্য সবকিছুকেও চালাতে সমান উৎসুক। জাহাজ, রেল, প্লেন, জেট। এখন মানুষ আকাশটাকে নতুন করে ঘৌড়দৌড়ের মাঠ করে তুলেছে। সেখানে নতুন বাজি ধরেছে যে সে ত্রিভুবনেশ্বর হবে, স্বর্গমর্ত তোলপাড় করবে। তাই জীবনের ৪৪০তে মানুষ বিশ্বকীর্তি স্থাপন করেছে।

কিন্তু 'ক্ষণিকের-পা' দিয়ে, কেউ সিলিয়া দিয়ে, কেউ দাঁড়া দিয়ে— নানা রকমের পা দিয়ে সবই চলেছে। চারিদিকে সবাই ছোটাছুটি করছে, কীসের এ জয়যাত্রা, এত ত্বরা? পৃথিবীটাও পাগলের মতো হন হন করে ছুটে চলেছে। পৃথিবীটাকে আমি একবার শুধিয়েছিলাম— তোমার কেন চলবার জন্য এত দায়। এ যাত্রা তোমার থামাও। সূয্যি তো কারুর পিছু পিছু ধাওয়া করছে না? তুমি কেন এত তাড়াতাড়ি করছো?

তার উত্তরে পৃথিবী কী জানিয়েছিল জানেন? তার দখিনা হাওয়ার ভিতর দিয়ে সে আমার কানে কানে বলেছিল— থামা মানে জীবনের শেষ। যতদিন আছো ততদিন চলো, দাঁড়িও না। শাশ্বত সত্যের দিকে যাওয়ার গতি বন্ধ করো না। চরৈবেতি...

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ উপনিষদে উক্ত 'চরৈবেতি' শব্দের অর্থ (যাত্রা থামাও/এগিয়ে যাও/দাঁড়িও না)।

১.২ পৃথিবী যে নিজের কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে তা প্রথম বলেন (গ্যালিলিও/ কোপারনিকাস সক্রেটিস)।

১.৩ ভাস্কো-ডা-গামা ছিলেন (মার্কিন/পর্তুগিজ/গ্রিক)।

১.৪ যে বৈজ্ঞানিক কারণে 'আপেল দৌড়ায় মাটির দিকে', সেটি হলো (মাধ্যাকর্ষণ/ প্লবতা/ সন্তরণ-নিয়ম)

১.৫ আইনস্টাইন ছিলেন (সপ্তদশ/অষ্টাদশ/উনবিংশ) শতাব্দীর মানুষ।প্রাণী মাত্রকেই খাবার সংগ্রহ করতে হয় — গাছ কীভাবে না দৌড়ে তার খাবার সংগ্রহ করতে পারে?

২. শূন্যস্থান পূরণ করো:

২.১ এফিড উড়বার সময় প্রতি সেকেন্ডে_____বার ডানা নাড়ায়।

২.২ গমন শক্তিকে বিচার করতে হয় সবসময়ে _____ হিসাব করে।

২.৩ গোবি মরুভূমিতে _____ নামক এক হরিণ আছে।

২.৪ _____ টারনস প্রতি বছরে এগারো হাজার মাইল একবার উড়ে আসে আবার পরে ফিরে যায়।

২.৫ ATP র পুরো কথাটি হলো_____।

৩. অতি-সংক্ষিপ্ত আকারে নীচের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাও:

৩.১ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় এমন দুটি প্রাণীর নাম লেখো।

৩.২ 'শামুক চলে যাবার সময় রেখে যায় জলীয় চিহ্ন'- সেটি আসলে কী?

৩.৩ 'আমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে একরকম ভবঘুরে সেল আছে।'—সেলটিকে 'ভবঘুরে' বলা হয়েছে কেন?

৩.৪ 'নানা জাতের খরগোশের মধ্যে গতির তারতম্য দেখা যায়' —কয়েকটি খরগোশের জাতির নাম লেখো।

৩.৫ 'কোনো কোনো পতঙ্গ উড়বার সময় তাদের ডানা প্রচণ্ড জোরে নাড়ে'--- তোমার চেনা কয়েকটি পতঙ্গের নাম লেখো। তাদের ছবি সংগ্রহ করে খাতায় লাগাও।

৩.৬ 'কত সামুদ্রিক জীব গা ভাসিয়ে মাইলের পর মাইল পাড়ি দেয় তার হিসাব আমরা রাখি না'— কয়েকটি সামুদ্রিক জীবের নাম লেখো।

৩.৭ 'রক্ষে এই যে.....' লেখক কোন বিষয়টিকে সৌভাগ্য বলে মনে করেছেন এবং কেন?

৩.৮ প্যারামোসিয়াম কীভাবে চলাফেরা করে?

৩.৯ প্যারামোসিয়াম ছাড়া দুটি এককোষী জীবের নাম লেখো।

৩.১০ 'তার চলাফেরার ভঙ্গিটি ভারি মজার' —কার চলার ভঙ্গির কথা বলা হয়েছে? তা 'মজার' কীভাবে?

৩.১১ গমনে সক্ষম গাছ ও গমনে অক্ষম প্রাণীর নাম লেখো।

৩.১২ কয়েকটি 'হক্' জাতীয় পাখির নাম লেখো।

৩.১৩ আফ্রিকার কী জাতীয় পাখি ওড়া ছেড়ে হাঁটায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে?

৩.১৪ ক্রমবিকাশের পথ পরিক্রমায় ঘোড়ার আঙুলের কোন পরিবর্তন ঘটেছে?

৩.১৫ পাঠ্যাংশে রয়েছে এমন একটি নিশাচর প্রাণীর নাম লেখো।

৪. **টীকা লেখো :** হিউয়েন সাঙ, শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর, ভাস্কো-ডা-গামা, শঙ্করাচার্য।

৫. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৫.১ প্রাণী মাত্রকেই খাবার সংগ্রহ করতে হয়—গাছ কীভাবে না দৌড়ে তার খাবার সংগ্রহ করতে পারে?

৫.২ প্রবন্ধে লেখক জানিয়েছেন যে খাবার সংগ্রহের কারণেই 'প্রাণীরা এক জায়গায় স্থাণু না হয়ে দিকে দিকে পরিভ্রমণ করে'।— তুমি কি এই মতটিকে সমর্থন করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৫.৩ 'গমনাগমনের প্রকৃত মাধুর্যটা আমাদের চেখে পড়ে সাধারণত উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে'।— পাঠ্যাংশে উচ্চতর প্রাণীদের গমনাগমনের মাধুর্য কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে আলোচনা করো।

৫.৪ ' এ পথে আমি যে গেছি'— রবীন্দ্রসংগীতের অনুষঙ্গটি পাঠ্যাংশে কোন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে?

৫.৫ 'এরকম মনে করলে ভুল হবে।'—কোন দুটি বিষয়ের ভুল সাপেক্ষে এমন মন্তব্য করা হয়েছে?

৫.৬ উচ্চতর জীবদের পেশি কাজ করার ক্ষেত্রে কীভাবে শক্তি উৎপাদিত হয়?

৫.৭ 'ক্রমবিকাশের ইতিহাসে জানা যায়' — এ প্রসঙ্গে লেখক কোন তথ্যের অবতারণা করেছেন?

৫.৮ 'মনের দৌড়ে মানুষ চ্যাম্পিয়ন' —এমন কয়েকজন মানুষের কথা লেখো যাদের শারীরিক অসুবিধা থাকলেও মনের দৌড়ে সত্যিই তাঁরা প্রকৃত চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠেছেন।

৫.৯ 'মানুষ এখন শুধু নিজে চলেই ক্ষান্ত নয়।' —নিজের চলা ছাড়া বর্তমানে মানুষ কী কী জিনিস চালাতে সক্ষম?

৫.১০ 'এখন মানুষ আকাশটাকে নতুন করে ঘোড়াদৌড়ের মাঠ করে তুলেছে।' ---মানুষের মহাকাশ-অভিযানের সাম্প্রতিকতম সাফল্য নিয়ে প্রিয় বন্ধুকে একটা চিঠি লেখো।

৫.১১'এ যাত্রা তোমার থামাও' —লেখক কাকে একথা বলেছেন? এর কোন উত্তর তিনি কীভাবে পেয়েছেন?

শিবতোষ মুখোপাধ্যায় (১৯২৬ - ১৯৯৩) : বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং প্রাণিবিজ্ঞানী। কলকাতার প্রেসিডেন্সি ও দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়-সহ আমেরিকার রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। জীববিদ্যার উন্নয়নমূলক গবেষণার জন্য জুলজিকাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে পেয়েছেন অসংখ্য স্বীকৃতি ও সম্মান। স্যার দোরাবজি টাটা স্বর্ণপদক, জয়গোবিন্দ স্বর্ণপদক প্রভৃতি এর মধ্যে অন্যতম। বিজ্ঞানভিত্তিক জনপ্রিয় লেখালেখিতেও তাঁর কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অণুর উত্তরায়ণ', 'লাবণ্যের অ্যানাটমি', 'দিক্‌বিদিক', 'মানহাটান ও মার্টিনি', 'আসা যাওয়ার পথের ধারে' প্রভৃতি।

নোট বই

সুকুমার রায়

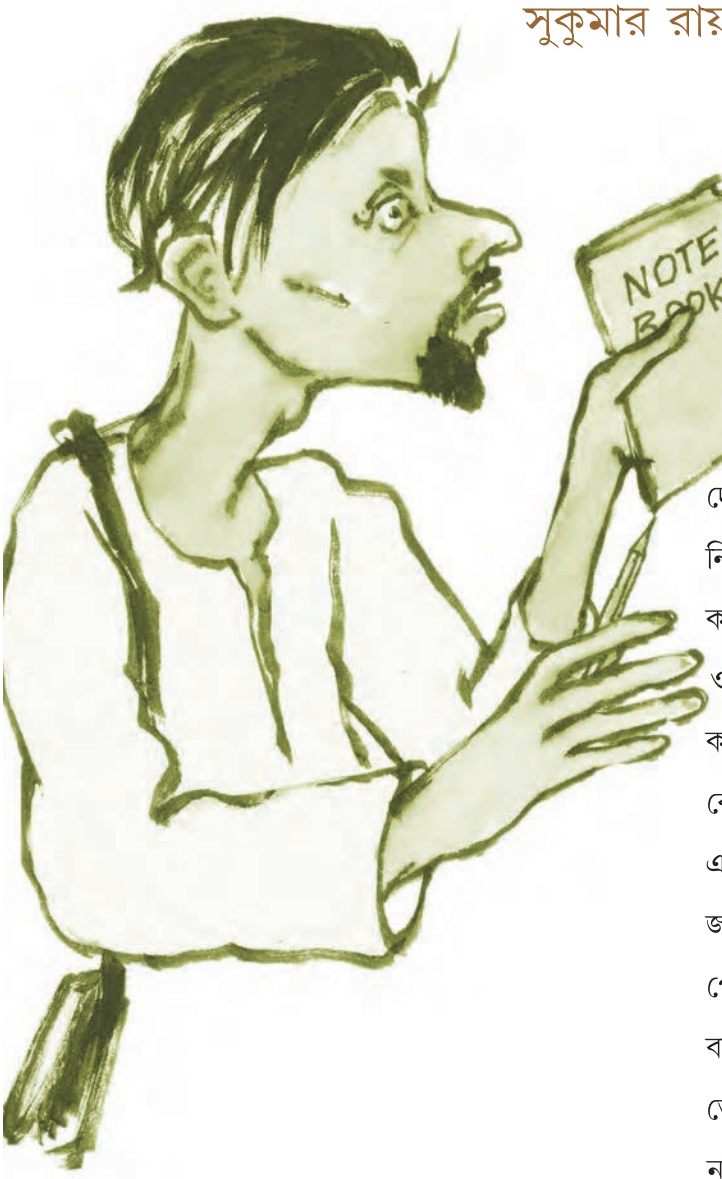

এই দেখো পেনসিল, নোটবুক এ হাতে,
এই দেখো ভরা সব কিলবিল লেখাতে।
ভালো কথা শুনি যেই চট পট লিখি তায়—
ফড়িঙের ক'টা ঠ্যাং, আরশুলা কী কী খায়;
আঙুলেতে আঠা দিলে কেন লাগে চটচট,
কাতুকুতু দিলে গোরু কেন করে ছটফট।
দেখে শিখে পড়ে শুনে বসে মাথা ঘামিয়ে
নিজে নিজে আগাগোড়া লিখে গেছি আমি এ।
কান করে কট কট ফোড়া করে টন টন—
ওরে রামা ছুটে আয়, নিয়ে আয় লণ্ঠন।
কাল থেকে মনে মোর লেগে আছে খটকা
ঝোলাগুড় কিসে দেয়? সাবান না পটকা?
এই বেলা প্রশ্নটা লিখে রাখি গুছিয়ে
জবাবটা জেনে নেব মেজদাকে খুঁচিয়ে।
পেট কেন কামড়ায়, বলো দেখি পারো কে?
বলো দেখি ঝাঁজ কেন জোয়ানের আরকে?
তেজপাতে তেজ কেন? ঝাল কেন লঙ্কায়?
নাক কেন ডাকে আর পিলে কেন চমকায়?
কার নাম দুন্দুভি? কাকে বলে অরণি?
বলবে কী, তোমরাও নোট বই পড়োনি!

হাতেকলমে

১. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১.১ নোট বই কী ধরনের লেখাতে ভরা?

১.২ বক্তা কী করে নিজে নিজে নোট বইটি লিখলেন?

২. **চটপট, চটচট, ছটফট, কটকট — এই শব্দগুলি কী ধরনের শব্দ? চটপট আর ছটফট এই দুটি শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য লেখো।**

৩. **নীচের বিশেষ্যগুলির আগে উপযুক্ত বিশেষণ বসাও :**

______লণ্ঠন, ______লংকা, ______আঠা।

৪. **একই অর্থযুক্ত আরেকটি শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :**

পা, উত্তর, অস্থিরতার ভাব, তীক্ষ্ণতা।

শব্দার্থ : চটপট — তাড়াতাড়ি/দ্রুত। ঠ্যাং—পা। চটচট —আঠালো। ছটফট—অস্থিরতার ভাব। খটকা—সন্দেহ। পিলে— প্লীহা। দুন্দুভি—ঢাক। অরণি—যে কাঠে আগুন জ্বলে বা চকমকি পাথর বা চিত্রক গাছ।

৫. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

বিশেষ্য	বিশেষণ
আঠা	______
______	মানসিক

৬. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৬.১ 'ভালো কথা শুনি যেই চটপট লিখি তায়'—বক্তা কোন কোন ভালো কথা নোট বইয়ে লিখে রেখেছিলেন?

৬.২ 'কাল থেকে মনে মোর লেগে আছে খটকা'—কাল থেকে মনে কী খটকা লেগেছে? এই খটকা কীভাবে দূর হবে?

৬.৩ 'বলবে কী, তোমরাও নোটবই পড়োনি!'—নোটবই পড়লে আর কী কী জানা যাবে?

সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩): 'আবোল তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু' ইত্যাদির স্রষ্টা সুকুমার রায়। পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। প্রত্যেক বাঙালির শৈশবে জড়িয়ে আছেন এই কবি ও সাহিত্যিক। চিত্রশিল্প, ফটোগ্রাফি, সরস ও কৌতুককর কাহিনি এবং ছড়া রচনায় সুকুমার রায় অতুলনীয়। তাঁর রচিত অন্যান্য বই— 'খাই খাই', ' অবাক জলপান', 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ইত্যাদি। স্বল্পদিনের জীবনে তিনি যা সৃষ্টি করে গেছেন তা থেকে বাঙালি জাতি চিরদিন অনাবিল আনন্দের স্বাদ পাবে।

৭. **নির্দেশ অনুসারে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

৭.১ ভালো কোনো কথা শুনলে কবিতার লোকটি কী করে?

৭.২ তার শোনা কয়েকটি ভালো কথার নমুনা কবিতা থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।

৭.৩ কিলবিল, ছটফট, কটকট, টনটন এগুলো কী ধরনের শব্দ?

৭.৪ 'মাথাঘামানো' এই বিশিষ্টার্থক শব্দবন্ধের অর্থ কী?

৭.৫ ভালো কোনো প্রশ্ন মনে এলে বক্তা কার সাহায্য নিয়ে সেগুলির উত্তর জেনে নেন?

৭.৬ মানুষের কাছে নোট বই থাকাকে কি তুমি জরুরি বলে মনে করো?

৭.৭ তুমি যদি নোট বই কাছে রাখো তাতে কী ধরনের তথ্য লিখে রাখবে?

৭.৮ 'জোয়ান' শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করে আলাদা বাক্য লেখো।

৭.৯ 'আগাগোড়া' এমন বিপরীতার্থক শব্দের সমাবেশে তৈরি পাঁচটি শব্দ লেখো।

৭.১০ কবিতাটিতে কোন কোন পতঙ্গের উল্লেখ রয়েছে?

৭.১১ কবিতায় উত্থাপিত কোন কোন প্রশ্নের উত্তর তুমি জানো?

৭.১২ কোন প্রশ্নগুলি পড়ে কবিতাটিকে তোমার কবির খেয়ালি মনের কল্পনা বলে মনে হয়েছে?

৮. **নীচের শব্দগুলির গদ্যরূপ লেখো :**

তায়, মোর, তেজপাতে।

৯. **বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে আর বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে বদলে লেখো :**

মন, চটচট, জবাব, পেট।

১০. **নীচের সর্বনামগুলিকে বাক্যে ব্যবহার করো :**

আমি, মোর, কে, কার, কাকে, তোমরা, নিজে।

১১. **নীচের বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় দুই অংশ সম্প্রসারণ করে লেখো :**

১১.১ ওরে রামা ছুটে আয় নিয়ে আয় লণ্ঠন।

১১.২ এই দেখো ভরা সব কিলবিল লেখাতে।

১১.৩ জবাবটা জেনে নেব মেজদাকে খুঁচিয়ে।

১১.৪ ঝাল কেন লংকায়।

১১.৫ বলবে কী, তোমরাও নোট বই পড়োনি!

১২. **নিম্নরেখ অংশগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো :**

১২.১ কাল থেকে মনে মোর লেগে আছে খটকা।

১২.২ ওরে রামা ছুটে আয়।

১২.৩ পেট কেন কামড়ায় বলো দেখি পারো কে?

১২.৪ নিজে নিজে আগাগোড়া লিখে গেছি আমি এ।

১২.৫ এই বেলা প্রশ্নটা লিখে রাখি গুছিয়ে।

মেঘ-চোর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পুরন্দর চৌধুরি চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে ফেলে বললেন, 'অসীমা, এবার আমি তোমাকে এমন একটা দৃশ্য দেখাব, যা তোমার আগে পৃথিবীতে কেউ কখনও দেখেনি। এরকম দৃশ্য কেউ কল্পনাও করেনি।'

ছোটো একটা রকেট আকাশের এক জায়গায় গোল হয়ে পাক খাচ্ছে। কম্পিউটারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কম্পিউটারই রকেটটাকে ঘোরাচ্ছে।

দুটিমাত্র আসন। পাশাপাশি বসে আছেন পুরন্দর ও অসীমা। পুরন্দরের মুখখানা ফরসা ও একেবারে গোল, প্রায় চাঁদের মতন, তাঁর চোখের মণি দুটো নীল। তাঁর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। বৃষ্টিবিজ্ঞানী হিসেবে সারা পৃথিবীতে তাঁর নাম। সাহারা মরুভূমিতে এক মাসে একশো ইঞ্চি বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে তিনি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড

করেছেন। এ-জন্য তাঁর প্রশংসা যত হয়েছে, নিন্দেও হয়েছে প্রায় ততটাই।

মেঘ থেকে ইচ্ছেমতন বৃষ্টিপাত ঘটানো এখন আর নতুন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু তিনি অন্য দেশ থেকে মেঘ তাড়িয়ে এনে সাহারায় বৃষ্টি ঝরিয়েছেন। সেই দেশে এবার বৃষ্টি কম হবে। একে মেঘ-চুরি বলা যায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনেকগুলি দেশ দাবি তুলেছে যে, মেঘ-চুরি আইন করে বদলানো দরকার।

অসীমার বয়েস সাতাশ। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে। পুরন্দর চৌধুরি বোস্টন শহরে আবহাওয়ার বিষয়ে একটি আলোচনায় যোগ দিতে এসেছিলেন। সেখানে অসীমার সঙ্গে তাঁর হঠাৎ আলাপ হয়। অসীমা নিজেই পুরন্দর চৌধুরির সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল।

সেই আলোচনা-সভায় কারপভ নামে একজন বিজ্ঞানী পুরন্দরকে মেঘ-চোর বলে গালাগাল দেওয়ায় তিনি এমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, চিৎকার করে কিছু বলতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান।

যখন তিনি চোখ মেললেন, তখন তিনি দেখলেন তাঁর মাথার কাছে বসে আছে এই সুন্দরী মেয়েটি। সে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

এই দুনিয়ায় পুরন্দর চৌধুরির আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। তিনি বিয়েও করেননি। বিদেশে একটি অচেনা বাঙালি মেয়েকে তাঁর সেবা করতে দেখে তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কে?'

অসীমা বলেছিল, 'আপনি আমায় চিনতে পারবেন না, কিন্তু আমি আপনার ছোটো ভাইয়ের মেয়ে।'

পুরন্দর প্রথমে বিশ্বাস করেননি। তাঁর একটি ভাই ছিল ঠিকই, কিন্তু সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে পঁচিশ বছর আগে। সেই ভাইয়ের নাম ছিল দিক্‌বিজয়।

অসীমা বলেছিল, 'আমার বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে যাননি, তিনি দেশ ছেড়ে ঘুরতে-ঘুরতে শেষ পর্যন্ত আলাস্কায় এসে সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। বিয়ে করেছিলেন একটি এস্কিমো মেয়েকে। তিনিই আমার মা। আমার বাবা আপনাকে খুব ভালোবাসতেন, মৃত্যুর আগেও আপনার কথা বলেছিলেন।'

বিদেশে এসে এমনভাবে একজন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়কে খুঁজে পেয়ে পুরন্দর চৌধুরি দারুণ খুশি হয়ে উঠেছিলেন। তারপর তিনি আর অসীমাকে ছাড়তে চাননি। তাঁর নিজস্ব রকেটে তিনি অসীমাকে নিয়ে বহু জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর আবহাওয়ার নানারকম রহস্য দেখাচ্ছেন।

ঘুরতে-ঘুরতে এখন ওঁরা এসেছেন আলাস্কার আকাশে। অসীমা তার বাবা-মায়ের সঙ্গে যেখানে থাকত, সে-জায়গাটাও দেখা হয়ে গেছে। সেখানে অবশ্য এস্কিমোদের ইগলুর বদলে এখন বড়ো-বড়ো এয়ারকন্ডিশানড্ বাড়ি উঠেছে। পুরন্দর চৌধুরি বললেন, 'নীচের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, ওটা কী দেখছ বলতে পারো?'

অসীমা বলল 'দেখতে পাচ্ছি একটা সোনালি রঙের পাহাড়। চূড়ার বরফের ওপর রোদ পড়েছে বলে সত্যিই সোনার মতন ঝকঝক করছে।'

'ওই পাহাড়টার নাম জানো?'

অসীমা ইতিহাসের ছাত্রী হলেও ভূগোলও বেশ ভালোই জানে। সে বলল, 'আমি আলাস্কার এত দূরে কখনও আসিনি বটে, তবে এই পাহাড়টার নাম মাউন্ট চেম্বারলিন। তার পাশেই যে কুয়াশায় ঢাকা হ্রদ, তার নাম লেক শ্রেভার।'

পুরন্দর খুশি হয়ে বললেন 'বাঃ! এবার তোমাকে আমি যা দেখাব, তা কিন্তু তুমি কাউকে বলতে পারবে না। সারা পৃথিবীতে দারুণ হইচই হবে এই নিয়ে, কিন্তু তুমি মুখ খুলতে পারবে না। ব্যাটা কারপভ, কীরকম জব্দ হয় এবার দেখো।'

অসীমা মৃদুভাবে বলল, 'বিজ্ঞানীদের উচিত নয় কিন্তু একজন আর-একজনকে জব্দ করা।'

'বোকাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, তাদের জ্ঞান কতটুকু! আমাকে মেঘ-চোর বলে, এত সাহস? আমি অন্যায়টা কী করেছি? সাইবেরিয়া থেকে মেঘ এনেছি সাহারায়। সাইবেরিয়ায় অত বরফ, সেখানে বৃষ্টি না হলে ক্ষতি কী আছে?'

অসীমা বলল, 'কিন্তু একবার এ রকম শুরু করলে, তারপর যদি যে-কোনো দেশ অন্য দেশের মেঘ চুরি করতে শুরু করে? তখন সে-দেশের মানুষের কী অবস্থা হবে?'

'আমি পৃথিবীর মানুষকে আর-একটা জিনিস শিখিয়ে দিয়ে যাব। যাতে ওরকম মেঘ চুরি হলেও কোনো ক্ষতি হবে না। যাকগে, সে-কথা পরে। তুমি তো ইতিহাসের ছাত্রী, পৃথিবীতে শেষ তুষার-যুগ কবে এসেছিল জানো?'

'এটা ঠিক ইতিহাসের বিষয় নয়, প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার। তবু আমি এটা জানি। শেষ হিমযুগ শেষ হয়েছিল তেরো হাজার বছর আগে।'

'ঠিক বলেছ। এই লেক শ্রেভার তৈরি হয়েছিল সেই সময়ে। মাউন্ট চেম্বারলিনের বরফগলা জল এই লেকে এসে জমে। আবার এই জল বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়ে মাউন্ট চেম্বারলিনের চূড়ায় গিয়ে আবার বরফ হয়ে যায়। এই সাইক্‌ল চলছে'।

'যেমন সমুদ্রের জল মেঘ হয়ে উড়ে যায়। আবার মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে সমুদ্র ভরাট হয়।'

'ওটা তো ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের মতন হলো। আসল বৃষ্টির হিসেবটা তোমাকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সারা বছর পৃথিবী থেকে কত জল বাষ্প হয়ে মেঘে উড়ে যায় জানো? পঁচানব্বই হাজার কিউবিক মাইল। তার মধ্যে আশি হাজার কিউবিক মাইলই যায় সমুদ্র থেকে। আবার ঠিক আশি হাজার কিউবিক মাইল বৃষ্টি হয়ে সমুদ্রে ফিরে আসে। আর মাত্র পনেরো হাজার কিউবিক মাইল বৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীর এত মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা সব বেঁচে আছে। প্রকৃতির হলো এটাই নিখুঁত হিসেব। কিন্তু এবার মানুষের সংখ্যা দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং মানুষের জন্যে বেশি বৃষ্টি দরকার।'

'আপনি এখানে আমাকে কী দেখাবেন বলেছিলেন?'

‘হ্যাঁ। এই যে নীচে দেখছ লেক শ্রেভার, এখানে একটা মজার ব্যাপার ঘটছে। এখানে যতখানি জল বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে, ঠিক ততখানি বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসছে না। কিছুটা কম ফিরে আসছে। অর্থাৎ হ্রদটা একটু-একটু করে শুকোচ্ছে। আমি হিসেব করে দেখেছি, এই হ্রদটা পুরোপুরি শুকোতে আরও দশ হাজার বছর লাগবে।’

‘আপনি কী করে জানলেন? ঠিক দশ হাজার বছর লাগবে?’

‘অঙ্কের হিসেবে! তুমি পৃথিবীর যে-কোনো পাহাড়, নদী, পুকুর, খাল-বিলের কাছে আমায় নিয়ে যাও, আমি অঙ্ক কষে বলে দেবো, সেখান থেকে কত জল বাষ্প হচ্ছে আর কত জল বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসছে। এই অঙ্ক আমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। কারপভও কিছুটা জানে,তবে আমার চেয়ে কম।’

‘আমি তো ইতিহাস পড়ি, অঙ্ক আমার মাথায় ঢোকে না।’

‘ইতিহাসেও তো অঙ্ক লাগে। অবশ্য সাধারণ যোগ-বিয়োগ। আচ্ছা ইতিহাসের ছাত্রী, তুমি আটলান্টিস নামে লুপ্ত সভ্যতার কথা জানো? সেটা কোথায় ছিল বলো তো?’

‘এটাও কিন্তু ইতিহাসের বিষয় নয়। আটলান্টিসের ব্যাপারটা গ্রিক লেখকদের জল্পনা-কল্পনা। অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি হয়েছে, এখনও কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি ঠিকঠাক।’

‘আমি যদি বলি এই লেক শ্রেভারের তলাতেই চাপা পড়ে আছে।’

‘সেটা দশ হাজার বছর পরে জানা যাবে!’

পুরন্দর চৌধুরি হা-হা করে হেসে উঠলেন। ছোট্ট একটা মশলার কৌটো খুলে একটা লবঙ্গ খেয়ে বললেন, ‘তুমি একটা নেবে নাকি?’

অসীমা একটা লবঙ্গ নিল।

পুরন্দর চৌধুরী বললেন ‘তুমি আর আমি কেউই তো দশ হাজার বছর বাঁচব না! ততদিনে পৃথিবীতে মানুষই থাকবে কিনা সন্দেহ! দশ হাজার বছর তো দূরের কথা, আমি দশ বছরও অপেক্ষা করতে রাজি নই।’

অসীমা চোখ বড়ো-বড়ো করে বলল, ‘তা হলে কি আপনি এই লেকটা খুঁজে দেখতে চান? এর তো প্রায় সবটাই বরফে ঢাকা!’

পুরন্দর মাথা নেড়ে বললেন, ‘খোঁড়াখুঁড়ি তো তোমাদের কাজ। আমি জল নিয়ে কারবার করি। জল কি খুঁড়তে হয়? এই যে এতবড়ো একটা লেক পড়ে আছে এখানে, এটা অপ্রয়োজনীয়, তাই না? কোনো মানুষ এখানে আসে না। দশ হাজার বছর ধরে লেকটা নিজে-নিজে শুকোতই— অতদিন অপেক্ষা না করে এখনই এটাকে শুকিয়ে ফেললে কেমন হয়?’

‘এতবড়ো লেকটা শুকোবেন কী করে? সেই জল ফেলবেন কোথায়?’

‘মেঘ করে ছড়িয়ে দেব। সেই মেঘ কারপভের দেশে পাঠিয়ে দেবো। ও খুব মেঘ-মেঘ বলে চ্যাঁচামেচি

করছিল যে'!

'এই বিশাল হ্রদের জল যদি মেঘ হয়ে যায়, সেই মেঘ থেকে অন্য জায়গায় বৃষ্টি হবে। একসঙ্গে হঠাৎ বৃষ্টি বেড়ে গেলে পৃথিবীর দারুণ কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে না!'

'কী আর হবে! সাইবেরিয়ায় বড়োজোর এক ইঞ্চি বেশি বরফ জমবে!'

অসীমা হেসে ফেলে বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। এতবড়ো লেক কি শুকিয়ে ফেলা যায়?'

পুরন্দর বললেন, 'বড়ো-বড়ো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যখন প্রথম হয়, তখন সবাই অবিশ্বাস করে। তোমাকে আর-একটি ছোট্ট ঘটনা বলি। ঘটনাটা ছোটো কিন্তু তার ফলটা হয়েছিল বিরাট। দশ লক্ষ বছরেরও কিছু বেশি আগে, এই পৃথিবীর উত্তাপ হঠাৎ একটু কমে গিয়েছিল। এ রকম হয়। পৃথিবীর উত্তাপ মাঝে-মাঝে কমে-বাড়ে। মাঝে-মাঝে—এই ধরো — দশ-পনেরো হাজার বছর পরে-পরে। আমি যেবারের কথা বলছি, সেবারে পৃথিবীর উত্তাপ কমেছিল মাত্র তিন থেকে চার ডিগ্রি ফারেনহাইট। সেলসিয়াসের হিসেবে খুব বেশি হলে দুই পয়েন্ট দুই। অতি সামান্য— তাতেই গোটা উত্তর আমেরিকাটা বরফে ঢেকে গিয়েছিল। কোথাও-কোথাও বরফ জমে গিয়েছিল এক হাজার ফিট উঁচু। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? এটা কিন্তু প্রমাণিত সত্য!'

অসীমা বলল, 'আপনার কথা অবিশ্বাস করব কেন? আমি ভাবছিলুম, আপনি আমাকে ছেলে-মানুষ ভেবে ঠাট্টা করছেন!'

'না, এসব ঠাট্টার ব্যাপার নয়। এবার বুঝলে তো, পৃথিবীর উত্তাপ একটুখানি কমে গেলেই কী কাণ্ড হয়? সেইরকম পৃথিবীর উত্তাপ যদি খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই সব বরফ গলতে শুরু করবে। আগে এই তাপ কমা-বাড়াটা সূর্যের ওপর নির্ভর করত। এখন মানুষই তা পারে। যেসব পাগলগুলো অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা জমিয়ে রেখেছে, সেগুলো যদি একসঙ্গে ফাটাতে শুরু করে তা হলে পৃথিবীর সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!'

'সে-কথা জানি! এতবড়ো লেকটাকে বাষ্প করে দেওয়ার জন্য আপনিও একটা অ্যাটম বোমা ফাটাবেন নাকি?'

'আমি ওসব বোমা-টোমায় বিশ্বাস করি না! আমি পুরন্দর চৌধুরি, আমার আবিষ্কার সব সময় মৌলিক। আলাস্কার এই চেম্বারলিন পাহাড়ের কাছে জনমনুষ্য নেই। এখানেই হবে আমার আবিষ্কারের পরীক্ষা। শুধু তুমি থাকবে তার সাক্ষী। তুমি আমার ভাইয়ের মেয়ে তাই তোমাকে এই মহান দৃশ্য দেখার সুযোগ দিচ্ছি। দশ হাজার বছর পরে যে-হ্রদটা শুকিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেটাকে আমি নিশ্চিহ্ন করে দেবো পাঁচ মিনিটে।'

'সত্যিই কি তা সম্ভব!'

'এক্ষুণি দেখতে পাবে!'

'এতবড়ো লেকটার জল বাষ্প হয়ে গেলে যে বিরাট মেঘ হবে, তার ধাক্কায় আমাদের রকেট টিকতে পারবে?'

‘আমরা মেঘলোকের অনেক উঁচুতে উঠে যাব! মেঘ আর কতটা উঠতে পারে!’

‘তারপর এতবড়ো মেঘকে আপনি সাইবেরিয়া পাঠাবেন?’

‘সবটা নাও পাঠাতে পারি, কিছু-কিছু বিক্রিও করতে পারি। যেসব দেশে বৃষ্টি কম, তাদের কয়েক টুকরো দেওয়া যেতে পারে।’

‘ততদিন আপনি এই মেঘ জমিয়ে রাখবেন কোথায়?’

‘উড়িয়ে নিয়ে বেড়াব। এক দেশ থেকে আর-এক দেশে উড়ে যাবে। যে-কোনো দেশের ওপর দিয়েই মেঘ উড়ে যাওয়া তো বেআইনি নয়!’

‘কিন্তু এই মেঘের সঙ্গে অন্য দেশের মেঘ উড়ে যেতে পারে না?’

‘তা পারে অবশ্য! জানো অসীমা, এতবড়ো একটা জলভরা মেঘ যদি আমাদের অধিকারে থাকে, তাহলে সেই মেঘখানাকে উড়িয়ে-উড়িয়ে আমরা পৃথিবীর সব মেঘ একসঙ্গে জুড়ে নিতে পারি। তখন কোথায় কখন বৃষ্টি হবে, তা আমি ঠিক করছি। আমি হব আকাশের দেবতা ইন্দ্র। আমার নাম পুরন্দর, তার মানে জানো তো? যে-ক’জন বিজ্ঞানী আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে, আমার নামে নিন্দে রটিয়েছে, তাদের দেশে আমি ইচ্ছে করলে একফোঁটাও বৃষ্টি না দিতে পারি।

অসীমা হঠাৎ মুখ নিচু করে মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল।

পুরন্দর একটু রেগে গিয়ে বললেন, ‘এখনও বুঝি তোমার সন্দেহ হচ্ছে!’

অসীমা বলল, ‘না, তা নয়। আপনি পঁচানব্বই হাজার কিউবিক মাইল আয়তনের এক বিশাল মেঘ নিয়ে আকাশে-আকাশে ফেরিওয়ালার মতন ঘুরছেন, আর সবক’টা দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছেন, বৃষ্টি নেবে? বৃষ্টি নেবে? এটা ভাবতেই কীরকম মজা লাগছে।’

পুরন্দর বললেন, ‘তুমি ঠিকই বলেছ। এটা মজারই ব্যাপার। আমি সত্যি-সত্যি অবশ্য সেরকম কিছু করব না। আমি তো মেঘের ব্যবসাদার নই। মানুষের ক্ষতি করতেও চাই না। শুধু ওই কারপভ আমাকে মেঘ-চোর বলেছে, ওর দেশে আমি এই প্রকাণ্ড মেঘটা পাঠিয়ে দিয়ে বলব, এই নাও ধার শোধ! সাইবেরিয়ায় কয়েক ইঞ্চি বরফ বেড়ে যাবে।’

অসীমা বলল, ‘কিন্তু সাইবেরিয়ায় যাওয়ার আগেই যদি এই মেঘ কোথাও ভেঙে পড়ে! কোনো দেশকে ভাসিয়ে দেয়?’

পুরন্দর বললেন, ‘সে রকম একটু ঝুঁকি আছে ঠিকই। কৃত্রিমভাবে তৈরি এই মেঘের চরিত্র কী হবে তা বলা যায় না। তবে নতুন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সময় এ রকম একটু ঝুঁকি নিতেই হয়। অবশ্য আমার যতদূর ধারণা, আমি মেঘটাকে ঠিক চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব!’

‘মনে করুন, সাইবেরিয়ার দিকে না গিয়ে এই মেঘটা আপনার দেশ কলকাতার আকাশের ওপর ভেঙে পড়ল, তা হলে সেই শহরের অবস্থা কী হবে?’

‘এ রকম জলভরা টলটলে মেঘ হঠাৎ ভেঙে পড়লে কলকাতার অর্ধেক বাড়ি ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু সে রকম অবস্থা আমি হতেই দেবো না। মেঘটা এদিক-ওদিক গেলেই আমি ফাটিয়ে দেবো কোনো নির্জন জায়গায়।’

এবারে তিনি নিচু হয়ে তাঁর বসবার জায়গার তলা থেকে একটি ফাইবার গ্লাসের বাক্স বার করলেন। সেই বাক্সের মধ্যে ফুটবলের সাইজের একটা ধাতুর বল।

সেই বলটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন, ‘এটা দেখছ, অসীমা। এটা আমার নিজের তৈরি। মার্কারির সঙ্গে আরও এগারোটি ধাতু মিশিয়ে তৈরি হয়েছে এই নতুন অ্যালয়। এর গুণ হচ্ছে জলের ছোঁয়া লাগলেই এটা গরম হতে শুরু করে। তারপর উত্তাপ এমন বাড়বে যে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। দ্যাখো, বাতাসে যে জলকণা আছে, তাতেই এটা গরম হতে শুরু করেছে। সেইজন্যেই এটাকে এয়ারটাইট অবস্থায় রাখতে হয়।’

অসীমা হাত দিয়ে দেখল, সত্যিই বলটা বেশ গরম।

পুরন্দর বললেন, ‘আমার হিসেব অনুযায়ী জলের মধ্যে মেশবার পর পাঁচ মিনিটেই এর উত্তাপ এত বাড়বে যে, গোটা লেকটারই বরফ গলে গিয়ে বাষ্প হয়ে যাবে। তারপর আমরা দেখব ওর তলায় আটলান্টিস আছে কি না। দু’রকম আবিষ্কারই হবে, কী বলো!’

অসীমা জিজ্ঞেস করল, ‘আমরা মেঘলোকের ওপরে উঠে গেলে মেঘের তলায় কী আছে তা দেখব কী করে?’

‘দেখতে পেলে তো হলো!’

‘আপনার এই গোল ধাতুটা কি একবার গরম হয়েই নষ্ট হয়ে যাবে?’

‘না, না, না এর ধ্বংস নেই। এটা যতবার ইচ্ছে ব্যবহার করা যাবে। সব জল শুকিয়ে গেলেই এটা আস্তে আস্তে আবার ঠান্ডা হতে শুরু করবে। এইবার তা হলে শুরু হোক।’

অসীমা তার কোটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট রিভলভার বার করে বলল, ‘পুরন্দর চৌধুরী, ওই বলটাকে আপনি এবার ওই এয়ার-টাইট বাক্সে ঢোকান। এবার আমাদের ফিরে যেতে হবে।’

দারুণ অবাক হয়ে চোখ কপালে তুলে পুরন্দর বললেন, ‘ এ কী অসীমা! তুমি ওটা তুলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন?’

অসীমা বলল, ‘আপনার দিকে অস্ত্র তুলতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু না হলে আপনি আমার কথা শুনতেন না। প্রকৃতিকে ধ্বংস করা একটা অপরাধ। আলাস্কার একটি লেক শুকিয়ে সাইবেরিয়ায় এতবড়ো একটা মেঘ পাঠালে প্রকৃতিতে মহাবিপর্যয় শুরু হয়ে যাবে। ড. কারপভের ওপর রাগ করে আপনি পৃথিবীর ক্ষতি

করতে চাইছেন!'

পুরন্দর চৌধুরি বললেন, ওটা সরিয়ে রাখো! পাঁচ মিনিটে এতবড়ো একটা মেঘ সৃষ্টি করার রেকর্ড করব আমি। তার সঙ্গে তোমার নামটাও থাকবে আমার ভাইঝি হিসেবে।'

'আমি আপনার ভাইঝি নই। আমি কারপভের মেয়ে।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ, আমার মা বাঙালি মেয়ে।'

'তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলে? তুমি একটা স্পাই।'

'ঠিক মিথ্যা বলিনি। আমার বাবা আপনাকে বড়োভাইয়ের মতন শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু তিনি বলেন, আপনি এক দেশের মেঘ অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে পাগলামি করছেন। সমুদ্র থেকে খাল কেটে সাহারায় জল আনা হচ্ছে, অন্য দেশের মেঘ আনার দরকার নেই।'

'তুমি, তুমি আমার এমন একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার নষ্ট করে দিতে চাও? তুমি আমার ওপর গুলি চালাও, আমাকে মেরে ফ্যালো, তবু এই গোলাটা আমি হ্রদে ফেলবই। আমি মরে গেলেও পৃথিবীর লোক জানবে যে পুরন্দর চৌধুরি কতবড়ো বিজ্ঞানী ছিল।'

অসীমা একবার বাইরের দিকটা দেখে নিয়ে পুরন্দরের দিকে স্থির ভাবে চেয়ে রইল।

পুরন্দর রকেটের একটা অংশ খুলতে যেতেই অসীমা বলল, 'ওটা খুলবেন না। তাহলে আমরা গুঁড়ো হয়ে যাব।'

'আমি এটা বাইরে ছুঁড়বই!'

'ছুড়ুন তাহলে। কিন্তু জানালা-টানালা খুলবেন না। এই সকেটের মধ্যে ফেলুন, নীচের পরপর কয়েকটা ভাল্‌ভ খুলে গিয়ে এটাকে বাইরে বার করে দেবে।'

'তার মানে! তুমি কী বলছ? জানালা খুলব না কেন?'

'ডক্টর পুরন্দর চৌধুরি, আপনি আবহাওয়া-বিজ্ঞানী। আমি কিন্তু শুধু ইতিহাসের ছাত্রী নই, কম্পিউটারেও আমার বিশেষ আগ্রহ। আগে থেকে প্রোগ্রাম করে রেখেছিলাম। কম্পিউটার এখন রকেটটাকে বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে পৃথিবীর অনেক ওপরে নিয়ে এসেছে। লেকটাকে কি আর দেখতে পাচ্ছেন? এখান থেকে আপনার বলটা ছুঁড়লেও লেকে পড়বে না। বলটা আস্তে-আস্তে ঠান্ডা হয়ে আসছে না?'

পুরন্দরের মুখটা হাঁ হয়ে গেল। সেই সুন্দর চেহারার মেয়েটার মাথায় এতসব বুদ্ধি! বায়ুমণ্ডলের বাইরে তাঁর অ্যালয়টা অকেজো!

অসীমা বলটা পুরন্দরের হাত থেকে নিয়ে ফেলে দিল সকেটে। তারপর বলল, 'ওটা মহাশূন্যেই থাক। তাহলে কোনোদিন আর জলের ছোঁয়া পাবে না। পৃথিবীর জল যেমন আছে তেমনই থাকুক!'

হাতেকলমে

টীকা:

সাহারা মরুভূমি: আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় গোটা উত্তরাংশ জোড়া ৯,৪০০,০০০ বর্গ কি.মি. বিস্তৃত পৃথিবীর বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি। আলজিরিয়া, মিশর, লিবিয়া, মালি, সুদান, তিউনিশিয়া সহ মোট বারোটি দেশ জুড়ে এই মরুভূমি।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ : ১৯৪৫-এ প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক আইন, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক বিকাশ, মানবাধিকার ও বিশ্বশান্তির লক্ষে প্রতিষ্ঠিত। মূল কার্যালয় নিউইয়র্ক, আমেরিকা। সদস্য দেশ ১৯৩।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় : আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স এ অবস্থিত, ১৬৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়।

বোস্টন: ম্যাসাচুসেটসের রাজধানী।

আলাস্কা: আমেরিকার উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম প্রদেশ। এর উত্তরে সুমেরু মহাসাগর, পূর্বে কানাডা এবং দক্ষিণ পশ্চিমদিক জুড়ে আছে প্রশান্ত মহাসাগর।

এস্কিমো: পূর্ব সাইবেরিয়া, আলাস্কা, কানাডা ও গ্রিনল্যান্ড জুড়ে বসবাসকারী জনজাতি। এদের প্রধান দুটি ভাগ হলো ইউপিক এবং ইনুইট।

ইগলু: এস্কিমোদের তৈরি বরফের বাড়ি। বরফ বায়ু নিরোধক বলে ইগলুর ভেতরের উষ্ণতা বাইরের প্রকৃতির থেকে অনেক বেশি থাকে।

মাউন্ট চেম্বারলিন: আলাস্কার ব্রুকস পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। উচ্চতা ২৭৪৯ মিটার।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪—২০১২) : জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুরে। ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ‘আত্মপ্রকাশ’ তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস, আর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘একা এবং কয়েকজন’। কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি অসামান্য। ছোটোদের মহলেও সমান জনপ্রিয় তিনি। প্রথম কিশোর-উপন্যাস ‘ভয়ংকর সুন্দর’। ‘নীললোহিত’ ছদ্মনাম ছাড়াও ‘সনাতন পাঠক’ ও ‘নীল উপাধ্যায়’ নামে অনেক লেখা লিখেছেন। ‘আনন্দ পুরস্কার’, ‘বঙ্কিম পুরস্কার’, ‘সাহিত্য আকাদেমি’ ইত্যাদি নানা পুরস্কারে তিনি সম্মানিত। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘প্রথম আলো’, ‘সেই সময়’, ‘পূর্ব পশ্চিম’, ‘মনের মানুষ’, ‘অর্জুন’, ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’। গ্রন্থ সংখ্যা দুশোর বেশি। তাঁর লেখাগুলি চলচ্চিত্রে, বেতারে ও টিভির পর্দায় রূপায়িত ও পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত।

১. **সন্ধি করো:**

বৃষ+তি　　অপ+ইক্ষা

গো+এষণা　　পরি+ঈক্ষা

আবিঃ+কার　　কিম্+তু

২. **সন্ধি বিচ্ছেদ করো:**

নিরুদ্দেশ, বিয়োগ, উত্তাপ, নির্জন, যুগান্ত।

শব্দার্থ : রকেট—পৃথিবীর অভিকর্ষের টান ছাড়িয়ে মহাশূন্যে যাওয়ার দ্রুতগামী যান। কম্পিউটার—যন্ত্রগণক। পুরন্দর—ইন্দ্র। দিক্‌বিজয়—সর্বদিক বা নানাদেশ জয়। তুষারযুগ—হিমযুগ। যুগান্তকারি—নতুন যুগ শুরু করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এয়ারকন্ডিশানড্— শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, বাতানুকূল। প্রাগৈতিহাসিক—যে যুগ থেকে ইতিহাস জানা গেছে তার পূববর্তী যুগের। নিশ্চিহ্ন—অদৃশ্য, উধাও। মার্কারি—পারদ। অ্যালয়—ধাতু সঙ্কর। এয়ারটাইট—বায়ুনিরোধক। স্পাই—চর, গোয়েন্দা। সকেট—কোটর। অকেজো—অকর্মণ্য, অব্যবহার্য।

৩. **নীচের শব্দগুলিতে ব্যবহৃত নঞর্থক উপসর্গগুলি দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করো।**

উপসর্গ	যেমন	নতুন তৈরি শব্দ
অ	অচেনা	
নি	নিখুঁত	
বি	বিদেশ	
নিঃ	নিশ্চিহ্ন	
বে	বেবন্দোবস্ত	

৪. **নঞর্থক উপসর্গ ছাড়া অন্যান্য উপসর্গের ব্যবহারে তৈরি শব্দও এই গল্পে কম নেই। এখানে সেই ধরনের একটি করে শব্দ দিয়ে দেওয়া হলো, প্রতিটি উপসর্গ দিয়ে তৈরি আরো পাঁচটি করে শব্দ লিখতে হবে তোমাকে।**

উপসর্গ	যেমন	নতুন তৈরি শব্দ
প্র	প্রশংসা	
আ	আলাপ	
বি	বিজ্ঞানী	
প্রাক্	প্রাগৈতিহাসিক	
সম্	সংক্ষেপ	
অধি	অধিকার	

৫. **"অসীমা বলল, না তা নয়,... এক বিশাল মেঘ নিয়ে আকাশে-আকাশে ফেরিওয়ালার মতন ঘুরছেন" আর... "আমি তো মেঘের ব্যবসাদার নই..." উদ্ধৃতাংশটিতে 'ফেরিওয়ালা' আর 'ব্যবসাদার' শব্দ দুটি পাচ্ছি। এই 'ওয়ালা' এবং 'দার' অনুসর্গ দুটি ব্যবহার করে অন্তত পাঁচটি করে নতুন শব্দ বানাও।**

ওয়ালা—

দার—

৬. **এই গল্পটিতে অজস্র শব্দ দ্বৈত ব্যবহৃত হয়েছে। কোনটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বুঝে নিয়ে অথবা গঠনগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নীচের খোপগুলিতে শব্দবাক্স থেকে শব্দ নিয়ে সঠিকস্থানে বসাও। একটি করে উদাহরণ দিয়ে দেওয়া হলো :**

দ্বিরুক্তি-অর্থে	উড়িয়ে উড়িয়ে
ঈষদর্থে/ সাদৃশ্য-অর্থে	মেঘ-মেঘ
প্রকৃত শব্দ+বিকৃত শব্দে	হইহই
সমার্থক শব্দযুগ্ম	আত্মীয় স্বজন,
বিপরীতার্থক শব্দযুগ্ম	যোগ-বিয়োগ,
ধ্বন্যাত্মক/অনুকারাত্মক	হা-হা

খালবিল, গাছপালা, হইচই, ঠিকঠাক, আত্মীয়স্বজন, জল্পনা-কল্পনা, খোঁড়াখুঁড়ি, ঝকঝক, জীবজন্তু, একটু একটু, হা-হা, যোগ বিয়োগ, খোঁজাখুঁজি, নিজে নিজে, মেঘ-মেঘ, চ্যাঁচামেচি, মাঝে মাঝে, কমে বাড়ে, পরে পরে, কোথাও কোথাও, বোমা-টোমা, কিছু কিছু, উড়িয়ে উড়িয়ে, মুচকি মুচকি, সত্যি সত্যি, টলটলে, এদিক ওদিক, জানলাটানলা।

৭. **সমার্থক শব্দ লেখো:**

জব্দ, নিরুদ্দেশ, কারবার, লুপ্ত, নিখুঁত, কৃত্রিম, ধ্বংস, শ্রদ্ধা, অনুগ্রহ, স্থির।

৮. **নীচের শব্দগুলির দুটি করে পৃথক অর্থ জানিয়ে প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা বাক্য লেখো:**

কাণ্ড, বল, যোগ, আলাপ, ব্যাপার, অঙ্ক, পর, ধার, চেয়ে, জন

৯. **সমোচ্চারিত/প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দগুলির অর্থ লিখে আলাদা আলাদা বাক্যরচনা করো:**

চাপা	যোগ	লক্ষ	দেশ	চুরি	কাটা
চাঁপা	যুগ	লক্ষ্য	দ্বেষ	চুড়ি	কাঁটা

১০. **স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো:**

১০.১ আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে **সে** ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে।

১০.২ অসীমা ইতিহাসের ছাত্রী হলেও **ভূগোলও** বেশ ভালই জানে।

১০.৩ তার মধ্যে আশি হাজার কিউবিক মাইলই যায় **সমুদ্র থেকে।**

১০.৪ **সাইবেরিয়ায়** বড়জোর এক ইঞ্চি বেশি বরফ জমে।

১০.৫ তাঁর নিজস্ব **রকেটে** তিনি অসীমাকে নিয়ে বহু জায়গাায় বেড়াচ্ছেন।

১১. একটি দুটি বাক্যে উত্তর দাও:

১১.১ 'মেঘ-চোর'-এর মতো তোমার পড়া দু-একটি কল্পবিজ্ঞানের গল্পের নাম বলো।

১১.২ এই গল্পে কজন চরিত্র? তাদের নাম কী?

১১.৩ 'মেঘ-চোর' কাকে বলা হয়েছে?

১১.৪ পুরন্দরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১১.৫ অসীমা সম্বন্ধে দু-একটি বাক্য লেখো।

১১.৬ পুরন্দর কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছেন?

১১.৭ রাষ্ট্রসঙ্ঘে বিভিন্ন দেশ কী দাবি তুলেছে?

১১.৮ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কোথায়?

১১.৯ পুরন্দরের মুখটা হাঁ হয়ে গেল কেন?

১১.১০ জ্ঞান ফিরে পুরন্দর অবাক হয়েছিলেন কেন?

১১.১১ দিক্‌বিজয় কে ছিলেন?

১১.১২ গল্পের ঘটনা যখন ঘটেছে তখন চরিত্রগুলি কোথায় ছিল?

১১.১৩ ইগলু-র পরিবর্তে সেখানে তখন কী দেখা যাচ্ছিল?

১১.১৪ কেন বলা হয়েছে অসীমা 'ভূগোলও বেশ ভালো জানে'?

১১.১৫ কে কোথা থেকে কোথায় মেঘ এনেছিল?

১১.১৬ তুষার যুগ কাকে বলে?

১১.১৭ পৃথিবী থেকে কত জল সারাবছর বাষ্প হয়ে মেঘে উড়ে যায়?

১১.১৮ মানুষের জন্য বেশি বৃষ্টি দরকার কেন?

১১.১৯ আটলান্টিস কী?

১১.২০ পুরন্দরের মতে আটলন্টিসের অবস্থান কোথায়?

১১.২১ সাইবেরিয়া কোথায়?

১১.২২ অসীমা কেন পুরন্দরকে ফেরিওয়ালা বলে ব্যঙ্গ করেছে?

১১.২৩ অ্যালয় কী?

১১.২৪ পুরন্দরের তৈরি গোলকটিতে আছে এমন কোন ধাতুর নাম গল্পে পেলে?

১১.২৫ পুরন্দরের তৈরি গোলকটি এয়ারটাইট রাখতে হয় কেন?

১১.২৬ ''প্রকৃতিকে ধ্বংস করা একটা অপরাধ''— কে, কাকে, কখন বলেছে?

১১.২৭ অসীমার প্রকৃত পরিচয় কী?

১১.২৮ ''তাহলে আমরা গুঁড়ো হয়ে যাব''— কে, কাকে, কেন বলেছে?

১১.২৯ অসীমার বিশেষ আগ্রহ কোন বিষয়ে?

১১.৩০ 'পৃথিবীর জল যেমন আছে তেমনই থাকুক' —কে কখন এই কথা বলেছে?

১২. আট দশটি বাক্যে উত্তর দাও:

১২.১ এই গল্পে কাকে কেন 'মেঘ-চোর' বলা হয়েছে? তার মেঘ চুরির কৌশলটি সংক্ষেপে লেখো।

১২.২ ''বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে অমিত বল, কিন্তু অযোগ্য মানুষের হাতে সেই ক্ষমতা হয়ে উঠতে পারে বিপজ্জনক এবং প্রাণঘাতী''— পঠিত গল্পটি অবলম্বনে উপরের উদ্ধৃতিটি বিশ্লেষণ করো।

১২.৩ পুরন্দর চৌধুরির চরিত্রটি তোমার কেমন বলে মনে হয়েছে— বিশ্লেষণ করো।

১২.৪ গল্পটি অবলম্বনে অসীমা চরিত্রটি সম্বন্ধে তোমার মতামত জানাও।

১২.৫ এই গল্পে পুরন্দর এবং অসীমা আসলে দুটি পৃথক এবং পরস্পরবিরোধী বিজ্ঞান চেতনার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কে, কোন ধারণার প্রতিনিধিত্ব করেছেন জানিয়ে তুমি এঁদের মধ্যে কাকে কেন সমর্থন করো বিশদে জানাও।

১২.৬ গল্পটিতে যতগুলি স্থাননাম আছে তার একটি তালিকা বানিয়ে প্রত্যেকটি স্থান সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখো।

দুটি গানের জন্মকথা

জনগণমন অধিনায়ক জয় হে

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

প্রথম গাওয়া হয়: ২৮ ডিসেম্বর ১৯১১ কলকাতায়

গানটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, কবে ও কোথায় রচিত তাও জানা যায় না। 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'-এর ২৬তম বার্ষিক অধিবেশন ২৬-২৮ ডিসেম্বর ১৯১১ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে এই গানটি প্রথম জনসমক্ষে গাওয়া হয় সমবেতকণ্ঠে, ২৭ ডিসেম্বর। গানের রিহার্সাল হয়েছিল ডা: নীলরতন সরকারের হ্যারিসন রোডের বাড়িতে, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরেরদিন 'দ্য বেঙ্গলি পত্রিকা' গানটির ইংরেজি অনুবাদ সহ সংবাদটি পরিবেশন করে। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় (মাঘ ১৩১৮) প্রথম প্রকাশিত গানটির পরিচয় দেওয়া হয় ব্রহ্মসংগীত বলে এবং এবছরের মাঘোৎসবেও গানটি ব্রহ্মসংগীত বলে গীত হয়।

গানটিকে ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে রবীন্দ্রনাথের বিরোধীগণ প্রচার করেন, গানটি সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারতে আগমনকে উপলক্ষ করে রচিত। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র পুলিনবিহারী সেন গানটি রচনার উপলক্ষ জানতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলে তিনি তাঁকে লিখেছিলেন (২০ নভেম্বর ১৯৩৭):

''...সে বৎসর ভারতসম্রাটের আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন অধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক, সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনোক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন।...''

গানটি নিয়ে নানারূপ সাময়িক তিক্ততা ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলেও রবীন্দ্রনাথ গানটিকে পরেও নানা উপলক্ষে ব্যবহার করেছেন। যেমন, দক্ষিণ ভারত পরিক্রমায় বেরিয়ে ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন মদনপল্লী—সেখানকার 'থিয়সফিক্যাল কলেজ' এর অধ্যক্ষ এবং রবীন্দ্রনাথের বন্ধু জেমস এইচ.কাজিন্স তাঁর সম্মানে এক সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন 'জনগণমন', এবং এর নামকরণ করেন 'The Morning Song of India'। সেই গানের সুর এবং অর্থগৌরব কলেজ কর্তৃপক্ষকে অভিভূত করেছিল— সেই গানটিই প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিনের অ্যাসেম্বলি সং বা বৈতালিকরূপে চলিত হয়ে যায়।

এর ১১ বছর পরে, ১৯৩০-র সেপ্টেম্বরে রবীন্দ্রনাথ জেনিভা থেকে গেলেন সোভিয়েট রাশিয়া। মস্কোয় 'পায়োনিয়ার্স কমিউন'এ অনাথ বালক বালিকারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। সেখানে প্রশ্নোত্তর পর্বের পর তারা কবিকে গান গাইতে অনুরোধ করতে, তিনি তাদের গেয়ে শুনিয়েছিলেন 'জনগণমন'।

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥

প্রথম গাওয়া হয়: ২৫ আগস্ট ১৯০৫

সরলা দেবী লিখেছেন তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা'য়:

...কর্তাদাদামহাশয় চুঁচুড়ায় থাকতে তাঁর ওখানে মাঝে মাঝে থাকবার অবসরে তাঁর বোটের মাঝির কাছ থেকে অনেক বাউলের গান আদায় করেছিলুম। যা কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্য প্রাণ ব্যস্ত থাকত——তাঁর মতো সমজদার আর কেউ ছিল না। যেমন যেমন আমি শোনাতুম——অমনি অমনি তিনি সেই সুর ভেঙে, কখনো কখনো তার কথাগুলিরও কাছাকাছি দিয়ে গিয়ে এক একখানি নিজের গান রচনা করতেন। 'কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ...', ' যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে...', ' আমার সোনার বাংলা...' প্রভৃতি অনেক গান সেই মাঝির কাছ থেকে আহরিত আমার সুরে বসান।...

প্রশান্তকুমার পাল অনুমান করেছেন, বঙ্গভঙ্গের নির্দিষ্ট তারিখটি জানতে পারার তাৎক্ষণিক আবেগে গানটি রচিত হয় ও ভক্তদের সূত্রে সমগ্র কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ তখন সপরিবারে গিরিডিতে। এখানে বসে তিনি ২২/২৩ টি গান রচনা করলেন, যেগুলি আজ স্বদেশি গান নামে পরিচিত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই গানগুলি সেসময় বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র স্থাপিত হলে গানটির এই প্রথম দশ পঙ্‌ক্তি সেখানকার জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা : গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ / সমীর সেনগুপ্ত

১. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

১.১ ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীতটি কোন উপলক্ষে প্রথম গাওয়া হয়েছিল?

১.২ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীতটির কোন পরিচয় দেওয়া হয়েছিল?

১.৩ রবীন্দ্রনাথ 'জনগণমন'র যে ইংরাজি নামকরণ করেন সেটি লেখো।

১.৪ ভারতবর্ষের জাতীয় মন্ত্রটি কী? সেটি কার রচনা?

১.৫ জাতীয় মন্ত্রের প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তি শিক্ষকের থেকে জেনে খাতায় লেখো।

২. **টীকা লেখো :** জাতীয় সংগীত, মাঘোৎসব, বিশ্বভারতী, পুলিনবিহারী সেন, ডা. নীলরতন সরকার।

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৩.১ 'জনগণমন'কে জাতীয় সংগীত রূপে গ্রহণ করতে বিরোধিতা হয়েছিল কেন? রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় সেই বিরোধিতার অবসান কীভাবে ঘটেছিল?

৩.২ 'রবীন্দ্রনাথ গানটিকে পরেও নানা উপলক্ষে ব্যবহার করেছেন।'— ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে এই গানটি ব্যবহার করেন?

কাজী নজরুলের গান

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

একদিন ঘটেছিলো একটি ঘটনা। যাচ্ছি ইস্কুলে। যত এগোচ্ছি, দেখছি হেদো পার্কের কাছে বেশ ভিড়। কী ব্যাপার বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম একে-ওকে। সবাই দেখলাম হেদোর কাছেই ভিড় জমাচ্ছে। কেউ একজন বললেন, জানো না খোকা, আজ নেতাজি এখানে বক্তৃতা দিতে আসবেন। জায়গাটির নাম ছিল বিডন স্ট্রিটের কাছে সরকার বাগান। নেতাজি আসবেন শুনে দাঁড়িয়ে গেলাম। ইশকুলের দিকে আর গেলাম না। একটু পরে আবার রোল উঠল কাজী নজরুলও আসছেন। এই দুই প্রিয় মানুষকে এত কাছ থেকে দেখব কোনোদিন ভাবিনি। উত্তেজনায় আমি তখন টগবগ করছি। বেশ অনেকক্ষণ পর দেখলাম এক দেবদূত মঞ্চ আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন। গৌরবর্ণ, উন্নত ললাট, অতীব সুপুরুষ সেই ব্যক্তিই কি নেতাজি, কাকে জিজ্ঞাসা করব? কে উত্তর দেবে? কারণ তখন মঞ্চে আরও একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে, নেতাজি স্বয়ং তাঁকে দুহাত তুলে প্রণাম করলেন। শুনলাম ইনি কাজী নজরুল ইসলাম। নেতাজির বক্তৃতার আগে নজরুলের গান হতেই হবে, এই ছিল তখনকার কোনো স্বদেশি মিটিং-এর রীতি। যাই হোক, একজন গাইলেন, আরেকজন বললেন। গায়ক যা

গান গাইলেন তা শুনতে শুনতে দেখলাম, সভা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। বুঝলাম কাজীর গান কী জিনিস! মুখ ভর্তি পান নিয়ে গলায় বাঁধা হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে কাজী নজরুল গাইছেন—এ ছবি আমি পরেও দেখেছি। তবে জীবনের প্রথম দেখা যে কোনও ভালো জিনিসই মনের মধ্যে গেঁথে যায়। তাই আজও কাজীদার সেই গান চোখ বুজলেই যেন শুনতে পাই। গানের পরে বক্তা কী বক্তৃতা দিলেন, তা আজ এত বছর পরে মনে নেই। তবে আমি দেখলাম অত ছোটো বয়েসেই আমার রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করেছে। আমার মধ্যে কী যে হলো কে জানে, দেখলাম আমি ছুটছি, রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়িতে চলে এলাম। উত্তেজনাকে কমানোর জন্যে টেনে নিলাম আমার প্রিয় সঙ্গী তবলাকে। ডুবে গেলাম তবলার বোলে!

(অনুলিখন : সাহানা নাগচৌধুরী)

১. কাজী নজরুল ইসলাম ব্যতীত কোন মনীষীর নাম পাঠ্যাংশে খুঁজে পেলে?

২. 'এই ছিল তখনকার কোনো স্বদেশি মিটিং-এর রীতি।' — কোন রীতির কথা এখানে বলা হয়েছে?

৩. পাঠ্যাংশে কার, কেমন দেহসৌষ্ঠবের পরিচয় ধরা পড়েছে?

৪. **টীকা লেখো :** কাজী নজরুল ইসলাম, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, স্বদেশি যুগ।

৫. কাজী নজরুল ইসলামের গান শুনে লেখকের মনে কোন অনুভূতির সৃষ্টি হলো? তখন তিনি কী করলেন?

৬. **শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে নীচের বিষয়গুলির মধ্যে কাজী নজরুলের লেখা কোন কোন গান খুঁজে পেলে লেখো:**
স্বদেশপ্রেম বিষয়ক; প্রকৃতি বিষয়ক; হাসির গান/ছড়ার গান; প্রেমের গান;ধর্মীয় অনুষঙ্গের গান।

রামকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২১—২০০৯) : বাংলা সংগীত জগতের প্রবাদ পুরুষ। সংগীতই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। দেশ-বিদেশে বিপুল খ্যাতি সম্পন্ন এই শিল্পীর সংগীত সাধনার পীঠস্থান ছিল কোলকাতা শহর। হারিয়ে যাওয়া বাংলা পুরাতনী গানকে তিনি নতুন প্রাণ দিয়েছেন। পাঠ্যাংশটি তাঁর 'পুরাতনী' নামক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। যেখানে তিনি পুরনো কোলকাতা, তখনকার বাঙালি জীবন, নানান বিখ্যাত মানুষজনের স্মৃতিচারণ করেছেন।

আছেন কোথায় স্বর্গপুরে

লালন ফকির

আছেন কোথায় স্বর্গপুরে কেউ নাহি তার ভেদ জানে।
কেন জিজ্ঞাসিলে খোদার কথা দেখায় আশমানে॥

পৃথিবী গোলাকার শুনি
অহর্নিশি ঘোরে আপনি।
তাইতে হয় দিন-রজনী
জ্ঞানীগুণী তাই মানে॥

তার একদিকেতে নিশি হলে
অন্যদিকে দিবা বলে।
আকাশ তো দেখে সকলে
খোদা দেখে কয়জনে॥

আপন ঘরে কে কথা কয়
না জেনে আশমানে তাকায়।
লালন বলে কে বা কোথায়
বুঝিবে দিব্যজ্ঞানে॥

লালন ফকির (অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ—ঊনবিংশ শতাব্দীর নবম দশক) : জন্মস্থান যশোহরের ঝিনাইদহ। তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। তিনি নিজে ধর্ম বিষয়ে উদার ছিলেন। বাউল ধর্মই তাঁর অন্তরের ধর্ম। এই সম্প্রদায়ের সাধক ও কবিদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক পরিচিত। তাঁর গান মূলত আধ্যাত্মিক, সংকেতে ভরা। লালনের গানের ভাষা সরল, ভাব গভীর। পাঠের গানটি আবুল আহসান চৌধুরী সংকলিত 'লালন সমগ্র' (পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ) থেকে গৃহীত।

স্মৃতিচিহ্ন

কামিনী রায়

ওরা ভেবেছিল মনে আপনার নাম
মনোহর হর্ম্ম্যরূপে বিশাল অক্ষরে
ইষ্টক-প্রস্তরে রচি চিরদিন তরে
রেখে যাবে! মূঢ় ওরা, ব্যর্থ মনস্কাম!
প্রস্তর খসিছে ভূমে প্রস্তরের 'পরে,
চারিদিকে ভগ্ন স্তূপ, তাহাদের তলে,
লুপ্ত স্মৃতি ; শুষ্ক তৃণ কাল-নদী জলে
ভেসে যায় নামগুলি, কেবা রক্ষা করে।
মানব হৃদয়-ভূমি করি' অধিকার,
করেছে প্রতিষ্ঠা যারা দৃঢ় সিংহাসন,
দরিদ্র আছিল তারা, ছিল না সম্বল
প্রস্তরের এতো বোঝা জড়ো করিবার ;
তাদের রাজত্ব হের অক্ষুণ্ণ কেমন—
কাল-স্রোতে ধৌত নাম নিত্য সমুজ্জ্বল॥

হাতেকলমে

- **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

ক. মহৎ মানুষদের জীবন কথা আমরা পাঠ করে থাকি কেন?

খ. অত্যাচারী কোন কোন সাম্রাজ্যলোভী জাতির কথা তুমি ইতিহাস পড়ে জেনেছ?

গ. অতীত ইতিহাসের ধূসর হয়ে আসা কোন স্মারক / সৌধ / মিনার তুমি দেখেছ?

ঘ. তোমার দৃষ্টিতে কাদের কথা সমাজের সকলের চিরকাল মনে রাখা উচিত?

ঙ. মানুষ নিজেকে স্মরণীয় করে রাখতে চায় কেন?

শব্দার্থ : হর্ম্ম্য—অট্টালিকা। ইষ্টকপ্রস্তরে—ইটপাথরে। ভূম—মাটি। কালনদী—সময়ের স্রোত।

১. **নীচের বিবৃতিগুলির মধ্যে যেগুলি ঠিক তাদের পাশে ✓ চিহ্ন আর যেগুলো ভুল তাদের পাশে ✕ চিহ্ন দাও :**

১.১ ইট-পাথরে গড়া সৌধ কাউকে চিরস্মরণীয় করে রাখে না।

১.২ যাঁরা নিজেদের সৌধ গড়ে কীর্তিকে অমর করে রাখতে চান তাঁরা বরেণ্য।

১.৩ সাধারণ মানুষের মনে যাঁরা স্থান পেয়েছেন, তাঁদের নাম ভেসে যায়।

১.৪ এমন বহু সহায়-সম্বলহীন, দরিদ্র মানুষ আছেন, মহাকাল যাঁদের স্মৃতি মুছে দিতে পারেনি।

১.৫ 'মানব হৃদয়-ভূমি' অধিকার করতে হলে মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজ করতে হবে।

২. **কবিতা থেকে শব্দ চয়ন করে নীচে প্রদত্ত কবিতাংশের শূন্যস্থান পূরণ করো :**

"ওরা ভেবেছিল _____ আপনার নাম
মনোহর _____ বিশাল _____
ইষ্টক _____ রচি চিরদিন _____
রেখে _____ !

৩. **নীচে দেওয়া শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**
মনোহর, বিশাল, মূঢ়, ব্যর্থ, ভগ্ন, লুপ্ত, শুষ্ক, অধিকার, দৃঢ়, অক্ষুণ্ণ, ধৌত, নিত্য, সমুজ্জ্বল।

৪. **নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো :**
নাম, মনোহর, প্রস্তর, মূঢ়, ব্যর্থ, ভগ্ন, স্তূপ, স্মৃতি, রক্ষা, মানব, হৃদয়, প্রতিষ্ঠা, দৃঢ়, দরিদ্র।

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) : বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত মহিলা কবি কামিনী রায় বরিশাল জেলার বাসন্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম চণ্ডীচরণ সেন। তিনি অতি শৈশবকাল থেকে কবিতা রচনায় প্রয়াসী হন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ **'আলো ও ছায়া'** মাত্র ১৫ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। তিনি বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে বি.এ. পাস করে ওই কলেজেই শিক্ষাব্রতীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো—**'পৌরাণিকী', 'দীপ ও ধূপ', 'জীবনপথে', 'মাল্য ও নির্মাল্য', 'অশোক সঙ্গীত'** প্রভৃতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ করেন।

৫. **নীচের শব্দগুলিকে বাক্যে ব্যবহার করো :**

অক্ষর, চিরদিন, স্মৃতি, মানব, রক্ষা, অধিকার, সম্বল, প্রতিষ্ঠা।

৬. **নীচের শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করো :**

মনোহর, মনস্কাম, ব্যর্থ, সিংহাসন, প্রতিষ্ঠা, সমুজ্জ্বল, প্রস্তর।

৭. **নীচের শব্দগুলির গদ্যরূপ লেখো :**

আপনার, রচি, তরে, খসিছে, ভূমে, আছিল, হের।

৮. **সমার্থক শব্দ লেখো :**

মন, হর্ম্ম্য, মূঢ়, দরিদ্র, নদী।

৯. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও :**

৯.১ 'স্মৃতিচিহ্ন' কবিতাটি কার রচনা?

৯.২ কবিতাটি তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

৯.৩ কবিতাটি কী জাতীয় রচনা?

৯.৪ কবিতায় কবি কাদের 'মূঢ়' ও 'ব্যর্থ মনস্কাম' বলেছেন?

৯.৫ তাদের স্মৃতি কীভাবে লুপ্ত হয়ে যায়?

৯.৬ কারা মানুষের মনে চিরস্থায়ী আসন লাভ করে?

৯.৭ 'কাল' কে কবিতায় কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

৯.৮ কবিতায় 'শুষ্ক তৃণ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

১০. **তিন-চারটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

১০.১ 'ওরা ভেবেছিল মনে...'— কাদের কথা বলা হয়েছে? তারা কী ভেবেছিল?

১০.২ 'মূঢ় ওরা'— কবিতায় তাদের মূঢ় বলার কারণ কী?

১০.৩ 'কেবা রক্ষা করে'— কী রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে? তা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না কেন?

১০.৪ 'দরিদ্র আছিল তারা'— কাদের কথা বলা হয়েছে? তাদের রাজত্ব কীভাবে অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলে কবি মনে করেন?

১০.৫ কালস্রোতে কাদের নাম ধুয়ে যায়? সেই স্রোত কাদের স্মৃতি গ্রাস করতে পারে না?

১০.৬ 'মানবহৃদয় ভূমি করি অধিকার'—কারা, কীভাবে মানবহৃদয় ভূমি অধিকার করে?

১০.৭ কবিতায় কবি কোন 'স্মৃতি'কে কেন অবিনশ্বর ও 'নিত্য সমুজ্জ্বল' বলেছেন?

১০.৮ তোমার দৃষ্টিতে মানুষের স্মরণীয় হয়ে থাকার শ্রেষ্ঠ পন্থাটি কী?

১১. স্মরণীয় কয়েকজন বাঙালি মনীষীর চিত্র ও বাণীসম্বলিত একটি চার্ট তৈরি করো।

১২. তুমি যাঁর জীবনের কথা জেনে অনুপ্রাণিত, এমন একজন মনীষীর জীবনের কোনো বিশেষ ঘটনার কথা বন্ধুকে লিখে জানাও/সে সম্বন্ধে দেওয়াল পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করো।

১৩. কবিতাটি থেকে যে শিক্ষা পেলে, সে বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো।

চিরদিনের

সুকান্ত ভট্টাচার্য

এখানে বৃষ্টিমুখর লাজুক গাঁয়ে
এসে থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা,
সবুজ মাঠেরা পথ দেয় পায়ে পায়ে
পথ নেই, তবু এখানে যে পথ হাঁটা।

জোড়া দিঘি, তার পাড়েতে তালের সারি
দূরে বাঁশঝাড়ে আত্মদানের সাড়া,
পচা জল আর মশায় অহংকারী
নীরব এখানে অমর কিষাণপাড়া।

এ গ্রামের পাশে মজা নদী বারো মাস
বর্ষায় আজ বিদ্রোহ বুঝি করে,
গোয়ালে পাঠায় ইশারা সবুজ ঘাস
এ গ্রাম নতুন সবুজ ঘাগরা পরে।

রাত্রি এখানে স্বাগত সান্ধ্য শাঁখে
কিষাণকে ঘরে পাঠায় যে আল-পথ;
বুড়ো বটতলা পরস্পরকে ডাকে
সন্ধ্যা সেখানে জড়ো করে জনমত।

দুর্ভিক্ষের আঁচল জড়ানো গায়ে
এ গ্রামের লোক আজো সব কাজ করে,
কৃষক-বধূরা ঢেঁকিকে নাচায় পায়ে
প্রতি সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে।

রাত্রি হলেই দাওয়ার অন্ধকারে
ঠাকুমা গল্প শোনায় যে নাতনিকে,
কেমন করে সে আকালেতে গতবারে,
চলে গেল লোক দিশাহারা দিকে দিকে।
এখানে সকাল ঘোষিত পাখির গানে
কামার, কুমোর, তাঁতি তার কাজে জোটে,
সারাটা দুপুর ক্ষেতের চাষির কানে
একটানা আর বিচিত্র ধ্বনি ওঠে।

হঠাৎ সেদিন জল আনবার পথে
কৃষক-বধূ সে থমকে তাকায় পাশে,
ঘোমটা তুলে সে দেখে নেয় কোনোমতে,
সবুজ ফসলে সুবর্ণ যুগ আসে॥

শব্দার্থ : বৃষ্টিমুখর—বৃষ্টিপতনের ধ্বনিপূর্ণ। ঘোষিত—প্রচারিত। আত্মদান—পরার্থে নিজের জীবন দান। ঢেঁকি—ধান ভানবার যন্ত্রবিশেষ। মজা নদী—বুজে যাওয়া নদী। দাওয়া—বারান্দা, রোয়াক। সান্ধ্য—সন্ধ্যাকালীন। আকাল—দুর্ভিক্ষ, দুঃসময়। কিষান—কৃষাণ,কৃষক, চাষি। দিশাহারা—দিগ্‌ভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। জনমত—সাধারণ বা অধিকাংশ লোকের অভিমত। ধ্বনি—শব্দ, রব।

১. **নীচের শব্দগুলির অন্তত দুটি অর্থ লেখো এবং দুটি পার্থক্য বাক্যে প্রয়োগ করো :**

কাঁটা, তাল, জোড়া, সারি, মজা, পাশ।

২. **নীচের শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য নির্দেশ করে দুটি আলাদা বাক্য তৈরি করো :**

কাঁটা	পার	জড়ো	সব	দীপ
কাটা	পাড়	জড়	শব	দ্বীপ

৩. **ঠিক বানানটি বেছে নাও:**

ব্যাস্ত/ব্যস্ত, সান্ধ্য/সান্ধ, দূর্ভিক্ষ/দুর্ভিক্ষ, বধু/বধূ, ধ্বনি/ধনি, সুবর্ণ/সুবর্ন।

৪. **নীচের শব্দগুলির কোনটি বিশেষ্য এবং কোনটি বিশেষণ বাছাই করে আলাদা দুটি স্তম্ভে সাজাও। এরপর বিশেষ্যগুলির বিশেষণের রূপ এবং বিশেষণগুলির বিশেষ্যের রূপ লেখো :**

লাজুক, ব্যস্ত, মাঠ, সন্ধ্যা, গ্রাম, ঘর, ঘোষিত, চাষি, জল, ফসল।

৫. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

মুখর, অহংকারী, অন্ধকার, একটানা, বিচিত্র।

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬—১৯৪৭) : বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাধর ও জনপ্রিয় কবি। 'কিশোর কবি' নামে পরিচিত। বাংলা কবিতায় তিনি সাম্যবাদী চেতনার বিস্তার ঘটান। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস', 'মিঠে কড়া'। 'চিরদিনের' কবিতাটি তাঁর 'ঘুম নেই' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

৬. 'ঘড়ির কাঁটা'— এখানে 'ঘড়ি' আর 'কাঁটা', এই দুটি শব্দের মধ্যে সম্বন্ধ তৈরি করেছে 'র' বিভক্তিটি, 'ঘড়ির কাঁটা'-কে আমরা তাই বলবো সম্বন্ধ পদ। এই কবিতায় এই রকম আরো ক'টি উদাহরণ খুঁজে পাচ্ছো, লেখো।

একটি করে দেওয়া হল— তালের সারি।

৭. সন্ধিবিচ্ছেদ করো :

বৃষ্টি, অহংকার, স্বাগত, পরস্পর, দুর্ভিক্ষ।

৮. নিম্নরেখ পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো :

৮.১ রাত্রি এখানে স্বাগত সান্ধ্য শাঁখে।

৮.২ এখানে সকাল ঘোষিত পাখির গানে।

৮.৩ এ গ্রামের পাশে মজা নদী বারো মাস।

৮.৪ ঠাকুমা গল্প শোনায় যে নাতনিকে।

৮.৫ কৃষক-বধূরা ঢেঁকিকে নাচায় পায়ে।

৯. বাক্য বাড়াও :

৯.১ চলে গেল লোক। (কখন? কেন? কোথায়?)

৯.২ আজ বিদ্রোহ বুঝি করে। (কে? কখন?)

৯.৩ ঘোমটা তুলে দেখে নেয় কোনোমতে। (কে? কী? কোথায়?)

৯.৪ এ গ্রাম সবুজ ঘাঘরা পরে। (কেমন? কীসের?)

৯.৫ দীপ জ্বলে। (কোথায়? কখন?)

১০. একটি বাক্যে উত্তর দাও:

১০.১ ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা কোথায় গিয়ে থেমে গেছে?

১০.২ তালের সারি কোথায় রয়েছে?

১০.৩ কিষানপাড়া নীরব কেন?

১০.৪ বর্ষায় কে বিদ্রোহ করে?

১০.৫ কে গোয়ালে ইশারা পাঠায়?

১০.৬ রাত্রিকে কীভাবে স্বাগত জানানো হয়?

১০.৭ কোথায় জনমত গড়ে ওঠে?

১০.৮ ঠাকুমা কাকে , কখন গল্প শোনান?

১০.৯ কোন গল্প তিনি বলেন?

১০.১০ সকালের আগমন কীভাবে ঘোষিত হয়?

১০.১১ কবিতায় কোন কোন জীবিকার মানুষের কথা আছে?

১১. আট দশটি বাক্যে উত্তর দাও:

১১.১ এই কবিতায় বাংলার পল্লি প্রকৃতির যে বর্ণনা আছে তা নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লেখো।

১১.২ কবিতাটিতে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাপনের যে ছবিটি পাও তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

১১.৩ আকাল ও দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে মানুষের সম্মিলিত শ্রম আর জীবনীশক্তি কীভাবে বিজয়ী হয়েছে, কবিতাটি অবলম্বনে তা বুঝিয়ে দাও।

১১.৪ ''কোনো বিশেষ সময়ের নয়, বরং আবহমান কালের বাংলাদেশ তার প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে জীবনের যে জয়গান গেয়ে চলেছে, এই কবিতায় তারই প্রকাশ দেখতে পাই।''— উপরের উদ্ধৃতিটির সাপেক্ষে কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

১২. ব্যাখ্যা করো:

১২.১ ''এখানে বৃষ্টিমুখর..... ঘড়ির কাঁটা''।

১২.২ ''এ গ্রামের পাশে..... বিদ্রোহ বুঝি করে''।

১২.৩ ''দুর্ভিক্ষের আঁচল.....কাজ করে''।

১২.৪ ''সারাটা দুপুর....বিচিত্র ধ্বনি ওঠে''।

১২.৫ ''সবুজ ফসলে সুবর্ণযুগ আসে''।

১৩. তোমার দেখা একটি গ্রামের কথা ডায়েরিতে লেখো। গ্রামটি কোথায়, সেখানে কোন কোন জীবিকার কতজন মানুষ থাকেন ইত্যাদি জানিয়ে গ্রামটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষজনের জীবনযাপন পদ্ধতি, বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার কথা লেখো। গ্রামটির উন্নতিসাধনে যদি তোমার কোনো পরামর্শ দেওয়ার থাকে, অবশ্যই সেকথা লিখবে।

জাতের বজ্জাতি

কাজী নজরুল ইসলাম

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া॥

হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে এক শ' খান!
এখন দেখিস ভারতজোড়া
পচে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া॥

জানিস না কি ধর্ম সে যে বর্ম সম সহনশীল,
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁওয়া-ছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল!
যে জাত-ধর্ম ঠুনকো এত,
আজ নয় কাল ভাঙবে সে তো,
যাক না সে জাত জাহান্নমে, রইবে মানুষ, নাই পরোয়া॥

(সংক্ষেপিত)

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮—১৯৭৬) : জন্ম বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে। গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয় কবি। বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী', 'সাম্যবাদী'। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান', 'চক্রবাক' প্রভৃতি। তিনি 'ধূমকেতু' পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি কিছু উপন্যাস, ছোটোগল্প ও নাটক লিখেছেন। তাঁর রচিত অজস্র গান বাঙালির অমূল্য সম্পদ।

তুমি নির্মল করো মঙ্গল-করে

রজনীকান্ত সেন

তুমি নির্মল করো মঙ্গল-করে
মলিন মর্ম মুছায়ে;
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক, মোর
মোহ কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে
আমি জানি না কখন ডুবে যাবে কোন
অকূল গরল-পাথারে!
প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হন্তা, তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা
তব শ্রীচরণ তলে নিয়ে এসো, মোর
মত্ত বাসনা গুছায়ে।
আছ অনল-অনিলে চির নভনীলে,
ভূধর-সলিলে গহনে,
আছ বিটপীলতায়, জলদের গায়
শশী-তারকায় তপনে,
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া,
বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে॥

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫—১৯১০) : জন্ম পাবনায়, ভাঙাবাড়ি গ্রামে। কর্মজীবনে আইনজীবী ছিলেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বাণী'। কান্তকবি নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। মূলত গান রচয়িতা। তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'কল্যাণী', 'অমৃত', 'আনন্দময়ী', 'বিশ্রাম', 'অভয়া' প্রভৃতি। ভক্তিমূলক, দেশপ্রেম বিষয়ক, হাসির গান রচনায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল।

সপ্তম পাঠ

ভানুসিংহের পত্রাবলি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

কলকাতা শহরটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে—মনে হয় যেন ইট-কাঠের একটা মস্ত জন্তু আমাকে একেবারে গিলে ফেলেচে। তার উপরে আবার আকাশ মেঘে লেপা, রাত্তির থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়চে। শান্তিনিকেতনের মাঠে যখন বৃষ্টি নামে তখন তার ছায়ায় আকাশের আলো করুণ হয়ে আসে, ঘাসে ঘাসে পুলক লাগে, গাছগুলি যেন কথা কইতে চায়, আমার মনের মধ্যে গান জেগে ওঠে আর তার সুর গিয়ে পৌঁছোয় দিনুর ঘরে। আর এখানে নববর্ষা বাড়ির ছাদে ঠোকর খেতে খেতে খোঁড়া হয়ে পড়ে,— কোথায় তার নৃত্য, কোথায় তার গান, কোথায় তার সবুজ রঙের উত্তরীয়, কোথায় তার পুবে বাতাসের উড়ে-পড়া জটাজাল।

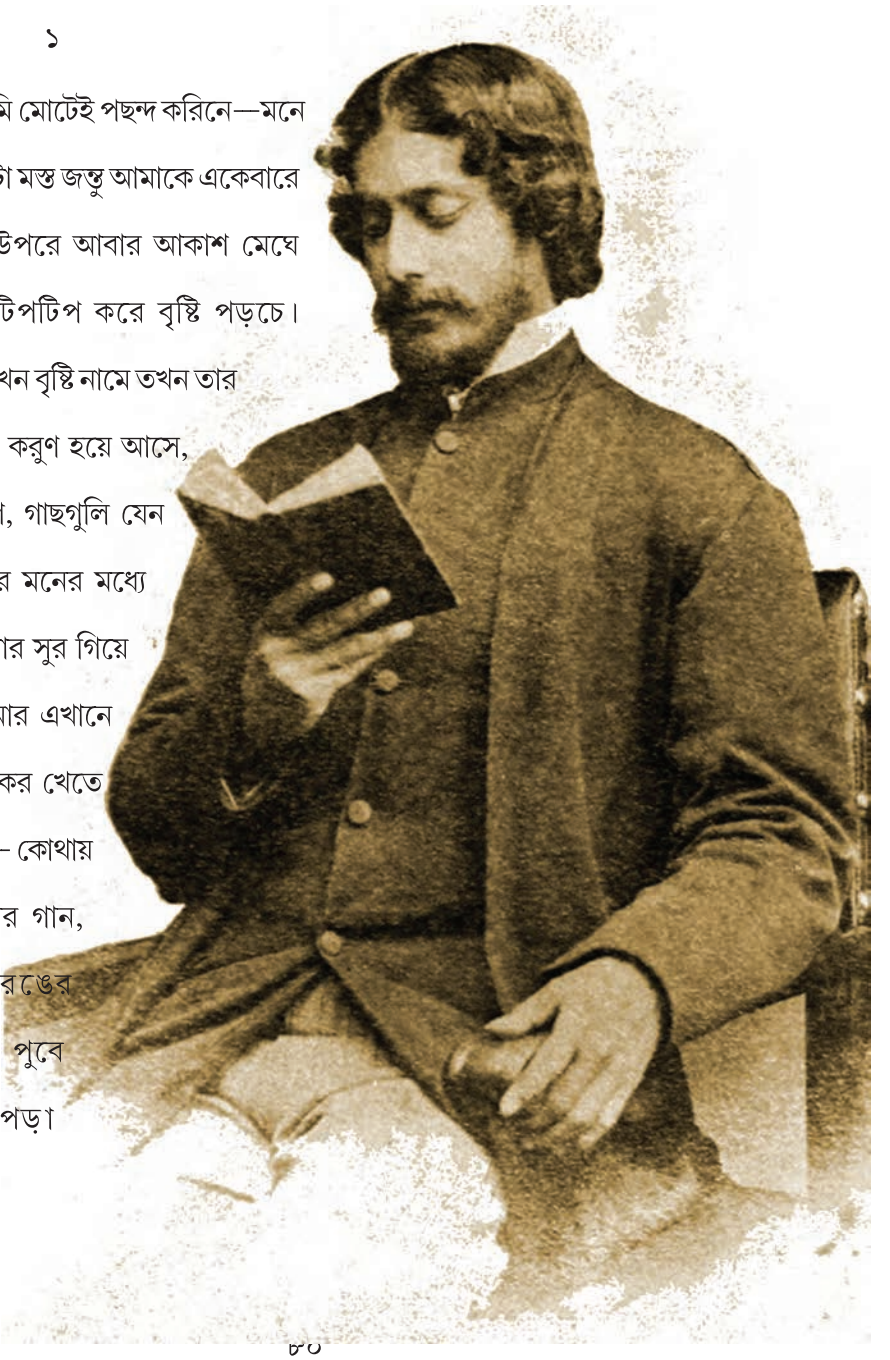

কথা হচ্ছে এবার শ্রাবণ মাসে আর বছরের মতো কলকাতায় বর্ষামঙ্গল গান হবে। কিন্তু যে-গান শান্তিনিকেতনের মাঠে তৈরি সে-গান কি কলকাতা শহরের হাটে জমবে। এখানে অনুরোধে পড়ে কখনো কখনো আমার নতুন বর্ষার গান গাইতে হয়েচে। কিন্তু এখানকার বৈঠকখানায় সেই গানের সুর ঠিক মতো বাজে না। তোমাদের ওখানে এতদিনে বোধহয় বর্ষা নেমেচে, অতএব তোমার নতুন শেখা বর্ষার গান কখনো কখনো গুনগুন স্বরে গাইতে পারবে, কখনো বা এসরাজে বাজিয়ে তুলবে। তুমি যাওয়ার পর আরো কিছু কিছু নতুন গান আমার সেই খাতায় জমে উঠেচে, কলকাতায় না এলে আরো জমত। এদিকে দিনুবাবুও দাঁত তোলাবার জন্যে দু-তিন দিন হলো কলকাতায় এসেচেন;—আষাঢ় মাসের বর্ষাকে এ শহরে যেমন মানায় না, দিনুবাবুকেও তেমনি। আজ সকালেই সে পালাবে স্থির করেচে। ইতি ২৯ আষাঢ়, ১৩২৯।

২

আত্রাই নামক একটি নদীর উপর বোটে করে ভেসে চলেচি। বর্ষার মেঘ ঘন হয়ে আকাশ আচ্ছন্ন করেচে, একটু ঝোড়ো বাতাসের মতো বইচে, পাল তুলে দিয়েচে। নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ, স্রোত খরতর, দলে দলে শৈবাল ভেসে আসচে। পল্লির আঙিনার কাছ পর্যন্ত জল উঠচে ; ঘন বাঁশের ঝাড় ; আম কাঁঠাল তেঁতুল কুল শিমুল নিবিড় হয়ে উঠে গ্রামগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে ; মাঝে মাঝে নদীর তীরে তীরে কাঁচা ধানের ক্ষেতে জল উঠেচে, কচি ধানের মাথা জলের উপর জেগে আছে। দুই তটে স্তরে স্তরে সবুজ রঙের ঘনিমা ফুলে ফুলে উঠেচে, তারি মাঝখান দিয়ে বর্ষার খোলা নদীটি তার গেরুয়া রঙের ধারা বহন করে ব্যস্ত হয়ে চলেচে, সমস্তটার উপর বাদল-সায়াহ্নের ছায়া। বৃষ্টি নেমে এল—দূরে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যাস্তের একটা ম্লান আভা এই বৃষ্টিধারার আবেগের উপর যেন সান্ত্বনার ক্ষীণ প্রয়াসের মতো এসে পড়েচে। আমার এই বোট ছাড়া নদীতে আর নৌকা নেই। এই জলস্থল আকাশের ছায়াবিষ্ট নিভৃত শ্যামলতার সঙ্গে মিল করে একটি গান তৈরি করতে ইচ্ছে করচে, কিন্তু হয়তো হয়ে উঠবে না। আমার দুই চক্ষু এখন বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে চায়, — খাতার দিকে চোখ রাখবার এখন সময় নয়। অনেকদিন বোলপুরে শুকনো ডাঙায় কাটিয়ে এসেচি, এখন এই নদীর উপর এসে মনে হচ্চে,— পৃথিবীর যেন মনের কথাটি শুনতে পাওয়া যাচ্চে। নদী আমি ভারি ভালোবাসি; আর ভালোবাসি আকাশ। নদীতে আকাশে চমৎকার মিলন, রঙে রঙে, আলোয় ছায়ায়, — ঠিক যেন আকাশের প্রতিধ্বনির মতো। আকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায় না এই জলের উপর ছাড়া।

আজ রাত্রের গাড়িতেই কলকাতায় যাব মনে করে ভালো লাগচে না। ইতি ২ শ্রাবণ, ১৩২৯।

হাতেকলমে

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ বর্ষামঙ্গল (আষাঢ়/অগ্রহায়ণ/শ্রাবণ) মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

১.২ শান্তিনিকেতন (বীরভূম/বাঁকুড়া/পুরুলিয়া) জেলায় অবস্থিত।

১.৩ কবি (আত্রাই/পদ্মা/শিলাবতী) নদীর ওপর বোটে করে ভেসে চলেছেন।

১.৪ পৃথিবীর মনের কথাটি কবি শুনতে পান (জলের ওপর/ নদীর ওপর/মাটির ওপর)।

১.৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি পত্রসাহিত্যের উদাহরণ হল— (শেষের কবিতা/গীতাঞ্জলি/ছিন্নপত্র)।

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

২.১ ''কলকাতা শহরটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে''— কবির এই অপছন্দের কারণ কী?

২.২ ''সে গান কি কলকাতা শহরের হাটে জমবে''— কোন গানের কথা বলা হয়েছে? সে গান কলকাতা শহরের হাটে জমবে না—কবির এমন ভাবনা কেন?

২.৩ ''তোমাদের ওখানে এতদিনে বোধহয় বর্ষা নেমেচে''— কার উদ্দেশ্যে কবি একথা লিখেছেন? 'ওখানে' বলতে কোন জায়গার কথা বলা হয়েছে?

২.৪ ''শান্তিনিকেতনের মাঠে যখন বৃষ্টি নামে...''— তখন কবির কেমন অনুভূতি হয়?

২.৫ ''আজ সকালেই সে পালাবে স্থির করেচে''— 'আজ' বলতে যে দিনটির কথা বলা হয়েছে তার সাল ও তারিখ কত? 'সে'—বলতে কার কথা বলা হয়েছে? সে কোথায় পালাবে এবং কেন?

২.৬ ''সমস্তটার উপর বাদল—সায়াহ্নের ছায়া''— কবির চোখ দিয়ে দেখা এই 'সমস্তটা'-র বর্ণনা দাও।

২.৭ ''কলকাতায় না এলে আরো জমত''— কী জমত? কবির কলকাতায় আসার সঙ্গে তা না জমে ওঠার সম্পর্ক কী?

২.৮ ''খাতার দিকে চোখ রাখবার এখন সময় নয়''— কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে? খাতার দিকে চোখ রাখবার সময় কবির নেই কেন?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। 'কথা ও কাহিনী', 'সহজপাঠ', 'রাজর্ষি', 'ছেলেবেলা', 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', ' হাস্যকৌতুক', 'ডাকঘর', 'গল্পগুচ্ছ'- সহ তাঁর বহু রচনাই শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে 'Song Offerings'- এর জন্যে প্রথম এশিয়াবাসী হিসেবে নোবেল পুরস্কার পান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা।

পাঠ্যাংশটি তাঁর লেখা চিঠির সংকলন 'ভানুসিংহের পত্রাবলি' বই থেকে নেওয়া হয়েছে ।

৩. **দু-চার কথায় পরিচয় দাও :**

শান্তিনিকেতন, দিনু, বর্ষামঙ্গল, আত্রাই।

৪. **একটি বর্ষণমুখর দিনের অভিজ্ঞতা বিষয়ে একটি ছোটো অনুচ্ছেদ রচনা করো।**

৫. **অর্থ লেখো :**

পুলক, উত্তরীয়, এসরাজ, আঙিনা, সায়াহ্ন, প্রয়াস, নিভৃত।

৬. **কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :**

৬.১ কোলকাতা শহরটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে।

৬.২ তার উপরে আবার আকাশ মেঘে লেপা।

৬.৩ আমার মনের মধ্যে গান জেগে ওঠে।

৬.৪ কলকাতায় বর্ষামঙ্গল গান হবে।

৬.৫ সে গান কি কলকাতা শহরের হাটে জমবে।

৭. **বাক্য রচনা করো :**

শান্তিনিকেতন, হাট, বাদল, বৃষ্টিধারা।

৮. **শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য দেখাও :**

সুর	—	শূর	আষাঢ়	—	আসার
নৃত্য	—	নিত্য	কূল	—	কুল
বর্ষা	—	বর্শা	সাড়া	—	সারা

শব্দার্থ : উত্তরীয় — চাদর। শৈবাল---শ্যাওলা। ছায়াবিষ্ট---ছায়ায় ঢাকা। ঘনিমা---ঘন হয়ে আসা। ম্লান—বিবর্ণ মলিন। আঙিনা—উঠোন। সায়াহ্ন—সন্ধে।

টীকা : দিনুবাবু---দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২—১৯৩৫)। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র ও দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। রবীন্দ্র সংগীতের প্রধান স্বরলিপিকার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ফাল্গুনী' নাটক দিনেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন এবং তাঁকে 'আমার সকল গানের ভাণ্ডারী' নামে অভিহিত করেন।

৯. বর্ষার কলকাতা শহরকে কবির বিশেষভাবে অপছন্দ করার কারণ কী?

১০. নববর্ষা বলতে কী বোঝ?

১১. বর্ষার ঋতুকে নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুটি গান ও দুটি কবিতার নাম লেখো।

১২. সবুজ রঙের উত্তরীয় বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

১৩. কলকাতা শহরে হাট...শহরকে হাটের সঙ্গে তুলনার ব্যঞ্জনাটি কোথায়?

১৪. আষাঢ় মাসের বর্ষাকে কলকাতা শহরে মানায় না— কবির এ জাতীয় মন্তব্যের অর্থ কী?

১৫. আত্রাই নদীটি কোথায়? সেই নদীতে বোটে যেতে যেতে কবি কবে নির্বাচিত পত্রটি লিখেছিলেন?

১৬. নদীপাড়ের গ্রামগুলির ছবি কীভাবে কবির চোখে ধরা পড়েছে?

১৭. আকাশ আর নদীর প্রতি ভালোবাসা, সর্বোপরি বর্ষা প্রকৃতির প্রতি কবির পক্ষপাত কীভাবে পত্রদুটিতে প্রতিফলিত হয়েছে?

১৮. **ক্রিয়ার কাল নির্ণয় করো:**

১৮.১ কলকাতায় বর্ষামঙ্গল গান হবে।

১৮.২ অনুরোধে পড়ে কখনো কখনো আমার নতুন বর্ষার গান গাইতে হয়েচে।

১৮.৩ আজ সকালেই সে পালাবে স্থির করেছে।

১৮.৪ আত্রাই নামক একটি নদীর উপর বোটে করে ভেসে চলেচি।

১৮.৫ অনেকদিন বোলপুরের শুকনো ডাঙায় কাটিয়ে এসেচি।

১৯. **নীচের বাক্যগুলিকে দুটি বাক্যে আলাদা করে লেখো :**

১৯.১ কথা হচ্ছে এবার শ্রাবণ মাসে আর বছরের মতো কলকাতায় বর্ষামঙ্গল গান হবে।

১৯.২ শান্তিনিকেতনের মাঠে যখন বৃষ্টি নামে তখন তার ছায়ায় আকাশের আলো করুণ হয়ে আসে।

১৯.৩ আমার এই বোট ছাড়া নদীতে আর নৌকা নেই।

১৯.৪ আমার দুই চক্ষু এখন বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে চায়, খাতার দিকে চোখ রাখবার এখন সময় নয়।

১৯.৫ আজ রাত্রের গাড়িতেই কলকাতায় যাব মনে করে ভালো লাগচে না।

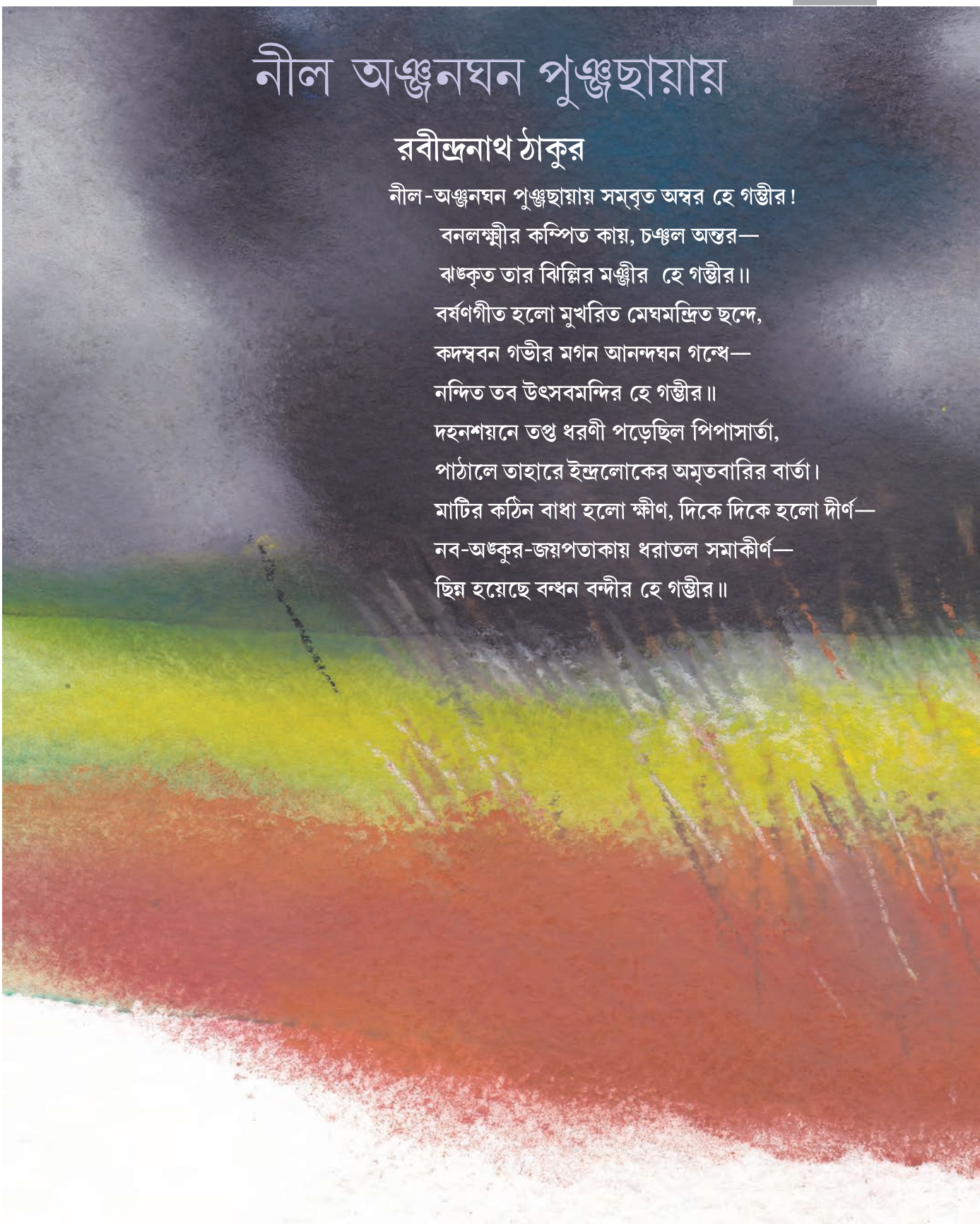

নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নীল-অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্‌বৃত অম্বর হে গম্ভীর!
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায়, চঞ্চল অন্তর—
ঝঙ্কৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর হে গম্ভীর॥
বর্ষণগীত হলো মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে—
নন্দিত তব উৎসবমন্দির হে গম্ভীর॥
দহনশয়নে তপ্ত ধরণী পড়েছিল পিপাসার্তা,
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা।
মাটির কঠিন বাধা হলো ক্ষীণ, দিকে দিকে হলো দীর্ণ—
নব-অঙ্কুর-জয়পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ—
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর হে গম্ভীর॥

ভারততীর্থ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হলো হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চিন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর—
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজও
বন্ধ নাশিবে— তারাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওংকারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার—
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে দুখের রক্তশিখা—
হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন করো মোর মন, শোনো রে একের ডাক—
যত লাজ ভয় করো করো জয়, অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ—
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

■ **নির্দেশ অনুসারে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

১. কবিতায় ভারতভূমিকে 'পুণ্যতীর্থ' বলা হয়েছে কেন?

২. 'মহামানবের সাগরতীরে' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

৩. ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে, কবিতা থেকে এমন একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করো।

৪. ভারতবর্ষকে পদানত করতে কোন কোন বিদেশি শক্তি অতীতে এদেশে এসেছিল? তাদের পরিণতি কী ঘটল?

৫. 'পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার' — উদ্ধৃতাংশে কোন পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে? এমন পরিস্থিতিতে কবির অন্বিষ্ট কী?

৬. 'আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।'

— কোন সুরের কথা বলা হয়েছে? তাকে 'বিচিত্র' বলার কারণ কী? কেনই বা সে সুর কবির রক্তে ধ্বনিত হয়?

৭. 'হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো...'

—'রুদ্রবীণা' কী? কবি তার বেজে ওঠার প্রত্যাশী কেন?

৮. 'আছে সে ভাগ্যে লিখা'— ভাগ্যে কী লেখা আছে? সে লিখন পাঠ করে কবি তাঁর মনে কোন শপথ গ্রহণ করলেন?

৯. 'পোহায় রজনী'—অন্ধকার রাত শেষে যে নতুন আশার আলোকোজ্জ্বল দিন আসবে তার চিত্রটি কীভাবে 'ভারততীর্থ' কবিতায় রূপায়িত হয়েছে?

১০. 'মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা' — কবি কাদের ব্যাকুল আহ্বান জানিয়েছেন? কোন মায়ের কথা এখানে বলা হয়েছে? এ কোন অভিষেক? সে অভিষেক কীভাবে সম্পন্ন ও সার্থক হবে?

১১. টীকা লেখো :

ওংকারধ্বনি, শক, হুন, মোগল, দ্রাবিড়, ইংরাজ।

১২. ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের কথা কবিতায় কীভাবে বিধৃত হয়েছে?

১৩. কবির দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ ভারতের যে স্বপ্নিল ছবি ধরা পড়েছে, তার পরিচয় দাও।

১৪. বাক্যে প্রয়োগ করো :

উদার, ধৃত, পবিত্র, লীন, মন্ত্র, অনল, বিপুল, বিচিত্র, সাধনা, জয়গান।

১৫. প্রতিশব্দ লেখো :

সাগর, ধরিত্রী, ভূধর, হিয়া, রজনী, নীর।

শব্দার্থ : ভূধর—পৃথিবী। ভেদি—ভেদ করে। শোণিত—রক্ত। হেরো—দেখো। বিরাজ—থাকা। ওংকার ধ্বনি—সকল মন্ত্রের আদি ধ্বনি। অভিষেক—সিংহাসনে বসবার প্রথম দিনের যে অনুষ্ঠান। কলরব—চিৎকার। আনত শিরে—মাথা নিচু করে।

১৬. 'শালা' শব্দের একটি অর্থ গৃহ, আগার।

'যজ্ঞশালা' র অনুরূপ 'শালা' পদযুক্ত আরো পাঁচটি শব্দ লেখো।

১৭. নীচের পঙ্‌ক্তিগুলি গদ্য বাক্যে লেখো :

১৭.১ দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হলো হারা।

১৭.২ উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।

১৭.৩ হৃদয়তন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।

১৭.৪ হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে।

১৭.৫ হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে।

১৮. বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিবর্তিত করো :

চিত্ত, পুণ্য, পবিত্র, এক, দ্বার, বিচিত্র, তপস্যা, দুঃখ, জয়, জন্ম, শুচি, লাজ।

১৯. সন্ধি বিচ্ছেদ করো : পরমানন্দ, দুর্বার, ওংকার, হোমানল, দুঃসহ।

২০. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : পুণ্য, ধীর, ধৃত, আহ্বান, দুর্বার, বিচিত্র, বহু, অপমান, বিপুল, ত্বরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। 'কথা ও কাহিনী', 'সহজপাঠ', 'রাজর্ষি', 'ছেলেবেলা', 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', ' হাস্যকৌতুক', 'ডাকঘর', 'গল্পগুচ্ছ'- সহ তাঁর বহু রচনাই শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে 'Song Offerings'- এর জন্যে প্রথম এশিয়াবাসী হিসেবে নোবেল পুরস্কার পান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা। 'ভারততীর্থ' কবিতাটি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী

কমলা দাশগুপ্ত

ননীবালা দেবী

ননীবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৮ সালে হাওড়া জেলার বালিতে। দেশও সেখানেই। পিতার নাম সূর্যকান্ত ব্যানার্জী, মা গিরিবালা দেবী। এগারো বছর বয়সে বিবাহের পর ষোলো বছর বয়সে তিনি বিধবা হন এবং বাবার কাছেই ফিরে আসেন। বিপ্লবী অমরেন্দ্র চ্যাটার্জীর কাছে বিপ্লবের দীক্ষা পেলেন ননীবালা দেবী। সম্পর্কে তিনি ননীবালা দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র। পলাতক অমর চ্যাটার্জী এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে প্রায় দুই মাস আশ্রয় দিয়ে রাখলেন তিনি রিষড়াতে। পুলিশের দৃষ্টি পড়ল এখানেও।

তল্লাশির সময় অমর চ্যাটার্জী পলাতক হন এবং রামচন্দ্র মজুমদার গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের সময় রামবাবু একটা 'মসার' (Mauser) পিস্তল কোথায় রেখে গেছেন সে-কথা জানিয়ে যেতে পারেননি। তখন বিধবা ননীবালা দেবী রামচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী সেজে, রামবাবুর সঙ্গে প্রেসিডেন্সি জেলে ইনটারভিউ নিয়ে জেনে এলেন পিস্তলের গুপ্ত খবর। ১৯১৫ সালে যে-যুগ ছিল তখন বাঙালি বিধবাদের পক্ষে এরকম পরের স্ত্রী সেজে, জেলে গিয়ে পুলিশের শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কাজ হাসিল করার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না—পুলিশ তো নয়ই, কোনো সাধারণ মেয়েও নয়। আজকের সমাজ ও সেদিনকার সমাজ, আজকের মেয়ে ও সেদিনকার মেয়ের মধ্যে আছে বিরাট সাগরের ব্যবধান। সেদিনকার নারী তৈরি করে দিয়ে গেছেন পরবর্তী যুগের বিপ্লবী নারীকে—তিনি পথ দেখিয়েছেন, ভিত্তি গেঁথে গেছেন তাঁদের জন্য।

পুলিশ ক্রমে জানতে পারল যে, ননীবালা দেবী রামবাবুর স্ত্রী নন। কিন্তু জানল না যে, ইনিই রিষড়াতে ছিলেন আশ্রয়দাত্রী।

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চন্দননগরে আবার বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। রিষড়ার মতো এখানেও মেয়েরা না থাকলে, বাড়ি ভাড়া পাওয়া যেত না। আবার ননীবালা দেবী এলেন গৃহকর্ত্রীর বেশে।

পলাতক হয়ে আছেন এখানে বিপ্লবী নেতা যাদুগোপাল মুখার্জী, অমর চ্যাটার্জী, অতুল ঘোষ, ভোলানাথ চ্যাটার্জী, নলিনীকান্ত কর, বিনয়ভূষণ দত্ত ও বিজয় চক্রবর্তী। এঁদের সকলেরই মাথায় অনেক হাজার টাকার হুলিয়া ছিল। এই নিশাচরেরা সারাদিন দরজা বন্ধ করে ঘরে কাটিয়ে দিতেন। শুধু রাতে সুবিধামতো বেরিয়ে পড়তেন। নিষ্ঠুর শিকারির মতো পুলিশ এসে পড়লেই এই পলাতকেরা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যেতেন, পুলিশ হয়রান হয়ে ফিরত।

এইভাবে চন্দননগরের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বাড়িতে তল্লাশি ও বিপ্লবীদের নিমেষে পলায়নের পর ননীবালা দেবীকে আর চন্দননগরে রাখা নিরাপদ হলো না। পুলিশ তৎপর হয়ে উঠল তাঁকে গ্রেপ্তার করতে।

ননীবালা পলাতক হলেন। তাঁর এক বাল্যবন্ধুর দাদা প্রবোধ মিত্র কর্মোপলক্ষে যাচ্ছিলেন পেশোয়ার। বাল্যবন্ধু তাঁর দাদাকে অনেক অনুনয় করে রাজি করালেন ননীবালাকে সঙ্গে নিয়ে যেত। ননীবালা দেবী পলাতক অবস্থায় তাঁর সঙ্গে পেশোয়ার গেলেন। প্রায় ষোলো-সতেরো দিন পরে পুলিশ সন্ধান পেয়ে যখন ননীবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করতে পেশোয়ার গেছে—তখন ননীবালা দেবীর কলেরা চলছে তিনদিন যাবৎ। প্রথমদিন বাড়ি ঘিরে রেখে তার পরদিনই নিয়ে গেল তাঁকে পুলিশ-হাজতে স্ট্রেচারে করে। কয়েকদিন সেখানে রেখে চালান করে দিল কাশীর জেলে। তখন তিনি প্রায় সেরে উঠেছেন।

কাশীতে আসার কয়েকদিন পরে, প্রতিদিন তাঁকে জেল-গেটের অফিসে এনে কাশীর ডেপুটি পুলিশ-সুপারিনটেন্ডেন্ট জিতেন ব্যানার্জী জেরা করত। ননীবালা দেবী সবই অস্বীকার করতেন; বলতেন কাউকেই চেনেন না, কিছুই জানেন না।

কাশীর জেল পুরনো, সেকেলে। সেখানে প্রাচীরের বাইরে মাটির নীচে একটা 'পানিশমেন্ট সেল' অর্থাৎ শাস্তি-কুঠুরি ছিল। তাতে দরজা ছিল একটাই, কিন্তু আলো বাতাস প্রবেশ করবার জন্য কোনো জানালা দরজা ছিল না। ব্যর্থকাম জিতেন ব্যানার্জী তিন দিন প্রায় আধঘণ্টা সময় ধরে ননীবালা দেবীকে ঐ আলোবাতাসহীন অন্ধকার সেলে তালাবন্ধ করে আটকে রাখত। কবরের মতো সেলে আধঘণ্টা পরে দেখা যেত ননীবালা দেবীর অর্ধমৃত অবস্থা, তবু মুখ দিয়ে স্বীকারোক্তি বের করতে পারল না। তৃতীয় দিনে বন্ধ রাখল তাঁকে আধঘণ্টারও বেশি, প্রায় ৪৫ মিনিট। স্নায়ুর শক্তিকে চূর্ণ করে দেবার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। সেদিন তালা খুলে দেখা গেল ননীবালা দেবী পড়ে আছেন মাটিতে, জ্ঞানশূন্য।

হাল ছেড়ে দিয়ে পুলিশ ননীবালা দেবীকে কাশী থেকে নিয়ে এল কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখানে গিয়ে তিনি খাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

সেখানে আই.বি. পুলিশের স্পেশাল সুপারিনটেন্ডেন্ট গোল্ডি (Goldie) তাঁকে জেরা করত।

—আপনাকে এখানেই থাকতে হবে। কী করলে খাবেন?

—যা চাইব তাই করবেন?

—করব।

—আমাকে বাগবাজারে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্ত্রীর কাছে রেখে দিন, তাহলে খাব।

—আপনি দরখাস্ত লিখে দিন।

ননীবালা তখুনি দরখাস্ত লিখে দিলেন।

গোল্ডি সেটা নিয়ে ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে ফেলে দিল। অমনি যেন বারুদে আগুন পড়ল। আহত ক্ষিপ্ত বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে ননীবালা এক চড় বসিয়ে দিলেন গোল্ডির মুখে। দ্বিতীয় চড় মারবার আগেই অন্য সি.আই.ডি. কর্মচারীরা তাঁর উদ্যত হাতকে চেপে ধরে রাখল, পিসিমা, করেন কী? অসীম শক্তি ফেটে বেরিয়ে আসছে তখন ননীবালা দেবীর ভিতর থেকে।

—ছিঁড়ে ফেলবে তো, আমায় দরখাস্ত লিখতে বলেছিল কেন? আমাদের দেশের মানুষের কোনো মানসম্মান থাকতে নেই?

দুই বছর এইভাবে বন্দিজীবন কাটিয়ে দিলেন তিনি। ১৯১৯ সালের এক প্রাতে এল ননীবালা দেবীর মুক্তির আদেশ।

বাইরে এসে তাঁর মাথা গুঁজবারও স্থান মিলল না। সকলেই পুলিশকে ভয় পায়। বহুদিন ধরে চলেছিল অনেক ওলটপালট ও ভাঙাগড়া। তারপর একটা আধঘুপচি ঘর ভাড়া করে নিজের জীবনের শূন্য সম্বল নিয়ে, আত্মীয়স্বজনের অনাদর ও লাঞ্ছনা এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও পরিপূর্ণ গৌরবে স্থির হয়ে কাটিয়ে চলেছিলেন তিনি বছরের পর বছর।

যে-মেঘের আত্মদানে পরবর্তীকালে শ্রাবণবর্ষণের মতো ঝরে পড়েছিল কত অসংখ্য কর্মী ও কর্মপ্রেরণা, এই মহীয়সী ছিলেন সেই পরিণতিসম্ভবা মেঘ।

দুকড়িবালা দেবী

১৮৮৭ সালে (বাংলা ১২৯৪, ৬ শ্রাবণ) দুকড়িবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেন বীরভূম জেলায় নলহাটি থানার ঝাউপাড়া গ্রামে। পিতা নীলমণি চট্টোপাধ্যায় এবং মা কমলকামিনী দেবী। স্বামী ছিলেন ঝাউপাড়া গ্রামেরই ফণীভূষণ চক্রবর্তী।

তাঁর বোনপোর নাম নিবারণ ঘটক। তিনি ছিলেন মাইনিং ক্লাসের ছাত্র। মাসিমা দুকড়িবালা নিবারণ ঘটককে খুব স্নেহ করতেন। বোনপো প্রায়ই তাঁর বাড়িতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসতেন। স্বদেশি বই, বেআইনি বই লুকিয়ে পড়বার আড্ডা ছিল মাসিমার বাড়ি।

বললেন, 'এবার আমায় দলে নিয়ে নাও।' বোনপো নিবারণ বলেন, 'তুমি কি এপথে আসতে পারবে মাসিমা? এমন বিপদের মুখে পা বাড়াতে নাই-বা এলে?' সিংহী গর্জে উঠে বললেন, 'তুমি যদি দেশের জন্য প্রাণ দিতে পার, তোমার মাও পারে।'

একদিন বোনপো নিবারণ সাতটা মসার (Mauser) পিস্তল এনে লুকিয়ে রাখতে দিলেন মাসিমা দুকড়িবালা দেবীকে। এগুলি ছিল রডা কোম্পানি থেকে চুরি করে আনা জিনিস। এই চুরির কাহিনি অভিনব। ১৯১৪ সালের ২৬ আগস্ট রডা কোম্পানির জেটি-সরকার শ্রীশ মিত্র বড়োসাহেবের হুকুম মতো মালপত্র খালাস করতে জাহাজঘাটে যান। তিনি ২০২টি অস্ত্রপূর্ণ বাকসো খালাস ক'রে সাতটি গোরুর গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে আসতে থাকেন। ছখানা গাড়ি তিনি রডা কোম্পানির গুদামে পৌঁছে দেন। একটি গাড়ির গাড়োয়ান ছদ্মবেশী বিপ্লবী হরিদাস দত্ত গাড়িটিকে নিয়ে উধাও হন। সেই গাড়িতে ৯টি বাক্সে ছিল কার্তুজ এবং একটিতে ৫০টি মসার পিস্তল। মালগুলি পরে বিপ্লবীদের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরিত হয়।

১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে একদিন পুলিশ দুকড়িবালা দেবীর বাড়ি ঘিরে ফেলে। তল্লাশিতে পাওয়া যায় সাতটা মসার পিস্তল। শত জেরাতেও মাসিমার মুখ থেকে বের করতে পারল না যে, কে দিয়েছে তাঁকে পিস্তলগুলি। গ্রামের মেয়ে গ্রামের বৌ দুকড়িবালা দেবী কোলের শিশু বাড়িতে রেখে চলে গেলেন পুলিশের সঙ্গে। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারের রায়ে দুকড়িবালা দেবীর সাজা হয় দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

বন্দীজীবনের অসহ্য পরিবেশের মধ্যে থেকেও, প্রতিদিন আধমণ ডাল ভাঙতে থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বাবাকে চিঠি লিখলেন, তিনি ভালোই আছেন, তাঁর জন্য যেন তাঁরা চিন্তা না করেন, শুধু বাচ্চাদের যেন তাঁরা দেখেন, শিশুরা যেন না কাঁদে।

এমনই ছিলেন তখনকার দিনের অগ্রগামী নারী-সৈনিকেরা। মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। সম্ভবত ১৯৭০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। *(ঈষৎ পরিবর্তিত ও নির্বাচিত অংশ বিশেষ)*

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ ননীবালা দেবী বিপ্লবের দীক্ষা পেয়েছিলেন (অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী/যাদুগোপাল মুখার্জী/ভোলানাথ চ্যাটার্জী)- এর কাছে।

১.২ ননীবালা দেবী (রিষড়াতে/চুঁচুড়াতে/চন্দননগরে) অমর চ্যাটার্জী ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে আশ্রয় দেন।

১.৩ চন্দননগর থেকে পালিয়ে ননীবালা দেবী যান (পেশোয়ারে/ কাশীতে/রিষড়াতে)।

১.৪ কাশীর ডেপুটি পুলিস সুপার (জিতেন ব্যানার্জী/হিতেন ব্যানার্জী/যতীন ব্যানার্জী) ননীবালা দেবীকে জেরা করতেন।

১.৫ পুলিশ সুপার গোল্ডির কাছে ননীবালা দেবী (সারদামনি দেবী/ভগিনী নিবেদিতা/দুকড়িবালা দেবী)-র কাছে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

১.৬ দুকড়িবালা দেবী বিপ্লবের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন (বোনপো/ভাইপো/ ভাই) নিবারণ ঘটকের কাছে।

১.৭ বিপ্লবী হরিদাস দত্ত (গাড়োয়ান/পুলিস/খালাসি)-র ছদ্মবেশে পিস্তল চুরি করেন।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:

২.১ বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদারের 'মসার'(পিস্তল)-এর খোঁজ নেওয়ার জন্য ননীবালা দেবী কী কৌশল অবলম্বন করেছিলেন?

২.২ ''এঁদের সকলেরই মাথায় অনেক হাজার টাকার হুলিয়া ছিল''—'হুলিয়া' শব্দটির অর্থ কী? এঁরা কারা? এঁদের আশ্রয়দাত্রী কে ছিলেন? হুলিয়া থাকার জন্য এঁরা কীভাবে চলাফেরা করতেন?

২.৩ ''ননীবালা দেবী পলাতক হলেন''—ননীবালা দেবী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন কেন? তিনি পালিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন? সেখানে তিনি কোন অসুখে আক্রান্ত হন?

২.৪ ''ননীবালা দেবী সবই অস্বীকার করতেন''—ননীবালা দেবী কোন কথা অস্বীকার করতেন? তার ফলশ্রুতিই বা কী হতো?

২.৫ কাশীর জেলের 'পানিশমেন্ট সেল'—টির অবস্থা কেমন ছিল? সেখানে ননীবালা দেবীর ওপর কী ধরনের অত্যাচার করা হত?

২.৬ ''ননীবালা দেবী তখুনি দরখাস্ত লিখে দিলেন''—ননীবালা দেবী কাকে দরখাস্ত লিখে দিয়েছিলেন? দরখাস্তের বিষয়বস্তু কী ছিল? শেষপর্যন্ত সেই দরখাস্তের কী পরিণতি হয়েছিল?

২.৭ ''এবার আমায় দলে নিয়ে নাও''—কে, কাকে এই অনুরোধ জানিয়েছিলেন? তিনি কেন, কোন দলে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন?

২.৮ পুলিশ কোন অভিযোগে দুকড়িবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করেন? বিচারে তাঁর কী শাস্তি হয়।

৩. **আট-দশটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

৩.১ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী স্বনামধন্য খ্যাতনামা বিপ্লবীদের তুলনায় ননীবালা দেবী ও দুকড়িবালা দেবীর অবদান সামান্য নয়—এ বিষয়ে তোমার মতামত জানাও।

৩.২ ননীবালা দেবী ও দুকড়িবালা দেবীর অনমনীয় বৈপ্লবিক মনোভাব কীভাবে পরবর্তী কালের বিপ্লবী নারীকে পথ দেখিয়েছে?—পাঠ্য গদ্যাংশ অবলম্বনে তোমার মতামত জানাও।

৪. ননীবালা দেবী এবং দুকড়িবালা দেবী ছাড়া তুমি আর কোন কোন মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীর কথা জানো? তাঁদের অবদানের কথা শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে জেনে নাও এবং খাতায় লেখো।

৫. **ঘটনার ক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখো :**

৫.১ চন্দননগরে যাদুগোপাল মুখার্জী, অমর চ্যাটার্জী, অতুল ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীকে আশ্রয়দান ও সেখান থেকে পলায়ন করলেন ননীবালা দেবী।

৫.২ পেশোয়ার থেকে গ্রেপ্তার করে কাশীতে পাঠানো হল ননীবালা দেবীকে এবং আলোবাতাসহীন বদ্ধ ঘরে তালাবন্ধ করে শাস্তি দেওয়া হত।

৫.৩ বাগবাজারে মা সারদার কাছে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে দরখাস্ত লিখলেন ননীবালা দেবী।

৫.৪ আই.বি. পুলিশের স্পেশাল সুপারিনটেন্ডেন্ট গোল্ডি ননীবালা দেবীকে জেরা করতেন।

৫.৫ অমর চ্যাটার্জী ও তাঁর সহকর্মীকে রিষড়াতে দুইমাস আশ্রয় দিলেন ননীবালা দেবী।

৫.৬ পুলিশ সুপার গোল্ডি দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলায় ক্ষিপ্ত ননীবালা দেবী এক চড় বসিয়ে দিলেন গোল্ডির মুখে।

৫.৭ ভাইপো অমরেন্দ্র চ্যাটার্জীর কাছে বিপ্লবের দীক্ষা পেলেন ননীবালা দেবী।

৫.৮ রামচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী সেজে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ননীবালা দেবী সংগ্রহ করলেন পিস্তলের গুপ্ত খবর।

৬. **কে, কোন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মিলিয়ে লেখো:**

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার	—	আইন অমান্য আন্দোলন
মাতঙ্গিনী হাজরা	—	সিপাহী বিদ্রোহ
সরোজিনী নাইডু	—	ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ
ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই	—	লবণ সত্যাগ্রহ

৭. **পাঠ্য গদ্যাংশটি পড়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে দু-চার কথা লেখো :**

অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী, প্রবোধ মিত্র, জিতেন ব্যানার্জী, গোল্ডি, নিবারণ ঘটক, হরিদাস দত্ত।

৮. **অর্থ লেখো ও বাক্য রচনা করো :**

হুলিয়া, মসার, দরখাস্ত, কারাদণ্ড, নিশাচর

শব্দার্থ : গ্রেপ্তার—আটক। তল্লাশি—খোঁজ। স্বীকারোক্তি—জবানবন্দি। ট্রাইবুনাল—বিচারসভা। জেরা—জবাবদিহি। জেটি সরকার—বন্দরে বা ঘাটে মালপত্র ওঠানামার হিসেব রাখেন যিনি।

৯. **নীচের স্থূলাক্ষর অংশগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো :**

৯.১ **বিপ্লবী অমরেন্দ্র চ্যাটার্জীর** কাছে বিপ্লবের দীক্ষা পেলেন ননীবালা দেবী।

৯.২ ১৯১৫ সালে **চন্দননগরে** আবার বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।

৯.৩ **স্নায়ুর শক্তিকে** চূর্ণ করে দেবার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা।

৯.৪ এগুলি ছিল **রডা কোম্পানি থেকে** চুরি করে আনা মাল।

৯.৫ ছখানা গাড়ি তিনি **রডা কোম্পানির** গুদামে পৌঁছে দেন।

৯.৬ **তল্লাশিতে** পাওয়া যায় সাতটা **মসার পিস্তল**।

৯.৭ শতজেরাতে ও **মাসিমার মুখ থেকে** বের করতে পারল না।

১০. **এককথায় লেখো :**

পলায়ন করেছেন যিনি, একসঙ্গে কাজ করেন যিনি, বাজ পাখির মতো তীক্ষ্ম দৃষ্টি, বাল্যকালের বন্ধু, আবেদন জানিয়ে লিখিত পত্র, মহানকর্মে ব্রতী নারী, এগিয়ে থাকেন যিনি/অগ্রে গমন করেন যিনি।

কমলা দাশগুপ্ত : ১৯০৭ --- ২০০০। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বর্ণময় চরিত্র। প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছেন । গোপনে বিপ্লবীদের অস্ত্র সরবরাহ করতেন। একাধিকবার কারাবরণ করেছিলেন ব্রিটিশের হাতে। তাঁর আত্মজীবনী 'রক্তের অক্ষরে' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। তিনি মন্দিরা পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সমস্ত নারী অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের জীবন ও লড়াইয়ের ইতিহাস রাখা রয়েছে তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী' নামক গ্রন্থে (১৯৬৩)। পাঠ্য রচনাংশটি এই বই থেকেই নেওয়া।

নবম পাঠ

রাস্তায় ক্রিকেট খেলা

মাইকেল অ্যানটনি

বর্ষাকালে রাস্তায় ক্রিকেট খেলার সুযোগ মিলত অল্পই। যখনই খেলতে যেতাম, বৃষ্টি এসে আমাদের তাড়া করে ফের উঠোনে ঢুকিয়ে দিত। বর্ষাকালে এই রকমই ছিল মেয়ারো। সেখানকার আকাশ সর্বদাই মেঘে ঢাকা থাকত, সমুদ্রের ওপর জলভরা কালো মেঘ মুখ গোমড়া করে নিচু হয়ে ঝুলত, আর বাতাস ছুটে এসে বদমেজাজ ঝাপট মারত নারকেলবনে। আর বাতাসের তেজ আর গর্জন যখন চরমে উঠত, তখন ঝুলে-পড়া মেঘগুলো ঘনকালো হয়ে উঠত, সমুদ্র হুংকার দিত, আর বৃষ্টির ফলাগুলো হট্টরোলে ভেঙে পড়ত আমাদের ওপর।

সবে দৌড়ে ফিরেছি বৃষ্টি থেকে। পাশের বাড়ির অ্যামি আর ভার্ন-এর খুব ফুর্তি। ওরা হাসছে। আশ্চর্য, রাস্তায় ক্রিকেট খেলতে ওদের যত আনন্দ, ঝমঝম বৃষ্টিতেও যেন ততই। অ্যামি আমাদের উঠোনে, হি হি করে হাসছে আর বৃষ্টির জল খাবার ভান করছে। ওর মুখ একেবারে ভেজা, জামাকাপড় জুবজুবে। ভার্ন আলশের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল, সে-ও হুজুগে মেতে লাফ মেরে ওর সঙ্গে জুটল। ওরা চ্যাঁচাতে লাগল :

'নেবুর পাতায় করমচা,

হে বৃষ্টি, স্পেনে যা।'

একটু পরেই পাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন তাদের মা ; তিনি নিশ্চয়ই শব্দ শুনে বুঝেছিলেন। ভার্ন আর অ্যামি ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হলো।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। বৃষ্টির জন্য মনটা খারাপ। তারপর ভার্ন-এর ব্যাট আর বল বাড়ির তলায় ঢুকিয়ে রেখে ভেতরে গেলাম। 'নিকুচি!' মনে-মনে বললাম। যখন বৃষ্টি নামল, তখন আমি ব্যাট করছিলাম। যখনই আমি ব্যাট করি, তখনই কেবল বৃষ্টি পড়ে! পাছে চাদর ময়লা হয়, তাই পা মুছে বিছানায় উঠে পড়লাম। বিষণ্ণ হয়ে বসেছিলাম, মনে হচ্ছিল সত্যিই বৃষ্টিটা চলে যাক (স্পেনে যাক, ভার্ন যা বলেছিল), এমন সময় কলজেটা যেন লাফ দিয়ে আমার গলায় উঠে এল। আকাশ চিরে কান-ফাটানো শব্দে বাজ পড়ল।

তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিলাম। ছাতের ওপর বৃষ্টির ভয়ানক হাতুড়ি পড়তে লাগল। বাজের ভয়ে সিঁটিয়ে রইলাম, জানি আবারও পড়বে, আর বিদ্যুতের অপার্থিব চমকের ভয়েও।

ভেতরে-ভেতরে হিংস্র আবহাওয়াকে আমি ভয় পেতাম। বৃষ্টির ভয়, তার সঙ্গী বাজ-বিদ্যুতের ভয়, উপকূলে আছড়ানো সমুদ্রের ভয়, ঝোড়ো হাওয়ার ভয়, বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর সবকিছু মরার মতো হয়ে থাকার ভয়। আর-একবার বিদ্যুৎ-ঝলকে চমকে উঠলাম। চমক ভাঙবার আগেই আবার এক-ভয়ংকর বজ্রপাতের শব্দে আকাশ কেঁপে উঠল। আমি চিৎকার করে উঠলাম। শুনতে পেলাম, মা ছুটে ঘরে ঢুকছে। আবার বাজ পড়ল আর আমি ছিটকে চলে গেলাম খাটের তলায়।

'সেলো! সেলো! প্রথমে তোর ব্যাট!' ভার্ন রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে ডাকে। বৃষ্টি থেমে গিয়ে রোদ উঠেছে, কিন্তু আমি এখনও ঠিক সামলে উঠিনি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাইরের দরজা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, ভার্ন দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছে আর অধৈর্যভরে হাত নেড়ে আমাকে ডাকছে।

‘তোর ব্যাট প্রথমে,’ সে বলে। যেন আমাকে নির্বিকার দেখেই সদ্য-বেরোনো অ্যামির দিকে সে তাকায়। ‘দু-নম্বর ব্যাট কে?’

‘আমি!’ আমি বলি।

‘আমি!’ প্রায় একই সঙ্গে অ্যামি চ্যাঁচায়।

‘আমি দুনম্বর ব্যাট’, ভার্ন বলে।

অ্যামি প্রতিবাদ করে, ‘না, আমি আগে “আমি’’ বলেছি।’

ভার্ন অধীর হয়ে পড়ে, এদিকে অ্যামি আর আমি তর্ক করি। তারপর যেন তার মাথায় একটা মতলব আসে। পকেট থেকে একটা পেনি বার করে বলে, ‘টস কর। কী চাস?’

আমি বলি, ‘হেড।’

অ্যামি ডাকে, টেল। ‘টেল পড়বেই?’

চাকতিটা ওপরে ওঠে, পড়ে উলটে যায়, টেল দেখা যায়।

ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠি, ‘আমি খেলবই না!’ তাতেও মনে হলো যথেষ্ট উৎপাত করা যায়নি, তাই দৌড়ে যাই যেখানে ভার্ন-এর ব্যাট আর বল রেখেছিলাম, সেগুলো নিয়ে আমাদের বাড়ির পেছনে অদৃশ্য। তারপর গায়ে যত জোর আছে তাই দিয়ে ওগুলোকে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলি।

যখন বাড়ির সামনে ফিরে আসি তখন ভার্ন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলে, ‘সেলো, ব্যাট আর বল কোথায়?’

আমি রাগে ফুঁসতে থাকি। ‘কীসের ব্যাট-বল, জানি না, যাও!’

‘ওর বাড়িতে বলে দে,’ অ্যামি চেঁচায়, ‘ফেলে দিয়েছে?’

ভার্ন জোর করে মুখ বেঁকিয়ে হাসির ভঙ্গি করে, বলে, ‘ভারি তো একটা পুরোনো ব্যাট আর বল।’

কিন্তু উঠোন থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ওর চোখের কোণে জল চিকচিক করে, দেখতে পাই।

বাকি বর্ষাকাল আর রাস্তায় ক্রিকেট খেলিনি আমরা। কখনো-কখনো বৃষ্টি থামত, চড়া রোদ উঠত, বেড়ার ওদিকে অ্যামি আর ভার্ন-এর গলা শুনতে পেতাম। এইসব সময়ে আমি রাস্তায় বেরিয়ে নিজের মনে শিস দিতাম, মনে-মনে ইচ্ছে হতো ওরা শুনতে পেয়ে বেরিয়ে আসতেও পারে। কিন্তু ওরা কখনও আসত না। আমি বুঝতাম ওরা তখনও খুব রেগে আছে, আর-কখনও আমাকে ক্ষমা করবে না।

এইভাবে চলল বর্ষাকাল। বজ্রে-বিদ্যুতে, উপসাগরের ঢেউয়ে আর মাতাল বাতাসে সেইরকমই ভয়-ধরানো ভাব। কিন্তু যে-সব লোকে এই কথা বলত, তারা বলত মেয়ারো তো এইরকমই, আর এই নিয়ে হাসাহাসি

চলত। আর কখনো-কখনো বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, এমনকী বাজের আওয়াজের মধ্যে দিয়েও বেড়ার ওপাশ থেকে ভেসে আসত ভার্ন-এর গলা, 'হে বৃষ্টি, স্পেনে যা,' আর আমি অনেকবার ঠিক করেছি সাহসী হবো কিন্তু যখনই বাজ পড়ত অমনি ছিটকে ঢুকতাম খাটের তলায়।

ভার্ন আর অ্যামির সঙ্গে আবার দেখা হলো নতুন বছরের গোড়ার দিকে। আনন্দের কথা, বর্ষা অনেকদিন কেটে গেছে ; দিনটা গরম, ঝকঝকে। বাড়ির দিকে পা চালাতে গিয়ে দেখি পা চালাচ্ছি ভার্ন আর অ্যামির দিকে, তারা সবে রাস্তায় ক্রিকেট খেলা শুরু করবে। কলজেটা দপদপায়। ওদের অবাস্তব আর অভিনব লাগে, যেন দূরে কোথাও চলে গিয়েছিল, আর ফিরতে চাচ্ছিল না। আমি খুব কাছে না-এসে পড়া পর্যন্ত ওরা খেয়াল করেনি। তারপর দেখি অ্যামি চমকে উঠেছে, তার মুখ উদ্ভাসিত।

'ভার্ন,' সে চেঁচিয়ে ডাকে, 'এই ভার্ন, দ্যাখ, সেলো!'

লজ্জিত হয়ে মাটির দিকে তাকাই, গাছ দেখি, কমলা রঙের আকাশ দেখি, এত খুশি লাগে যে কী বলব ভেবে পাই না। ভার্ন ড্যাবড্যাব করে চায়, তার মুখে দাঁত বের করা অদ্ভুত হাসি। চকচকে নতুন ব্যাটটার ওপর থেকে সে সেলোফেন কাগজ ছিঁড়ছে।

খোশমেজাজে বলে, 'নে সেলো, তুইই আগে ব্যাট কর।'

আমি কেঁদে ফেলি। যেন বৃষ্টি পড়ছে আর আমি ভয় পেয়েছি।

তরজমা: তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

মাইকেল অ্যানটনি (১৯৩০) : জন্ম ওয়েস্ট ইন্ডিজের মেয়ারোতে। মেয়ারো আর ত্রিনিদাদে শিক্ষাপর্ব শেষ করে ইস্পাত কারখানায় কাজ নেন। পরে চলে যান ইংল্যান্ডে। তারপর নানা দেশ বিদেশে পাড়ি জমান। ত্রিনিদাদ ও টোবাগো-র জীবন তাঁর উপন্যাসে আর গল্পে আশ্চর্য মূর্ত আর সজীব হয়ে ওঠে। পরম মমতায় তিনি বর্ণনা করেন আপাততুচ্ছ নানা ঘটনা আর তার মানবিক দিকগুলিকে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস হলো— 'গ্রিন ডেজ বাই দ্য রিভার' (নদীর ধারে সবুজ দিনগুলি, ১৯৬৭), 'স্ট্রিটস অফ কনফ্লিক্ট' (পথে পথে সংঘাত, ১৯৭৬) গল্পগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— 'ক্রিকেট ইন দ্য রোড অ্যান্ড আদার স্টোরিজ' (রাস্তায় ক্রিকেট ও অন্যান্য গল্প, ১৯৭৩)